'শ্রেষ্ঠ' কবিতা বলতে নিশ্চয়ই পড়া যায় এমন কবিতার কথাই বলা হয়েছে। নয়তো এতগুলো 'শ্রেষ্ঠ' কবিতা লিখতে পেরেছি এমন অহংকার আমার নেই।

বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা'রই পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত রূপ। কাজেই এ বই প্রকাশের পর 'সংকলিত কবিতা'র আর কোনো তাৎপর্য রইল না।

শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় যে-রকম উৎসাহ ও যত্ন নিয়ে বইখানি প্রকাশ করেছেন সেজন্য তাঁকে এবং 'ভারবি'র অন্যান্য কর্মীবন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

মণীন্দ্র রায়

সূচিপত্র

শ্রীমান অনিন্দ্য রায়
শ্রীমান অনন্য রায়

কল্যাণীয়েষু

মুক্তি

পৃথিবীতে রূঢ়তার শেষ নেই জানি।
ক্ষুরধার অতীতের দাহ
জীবনের স্তরে স্তরে
নিয়ে আসে বেদনার জ্বলন্ত প্রবাহ।

চারিদিকে শুধু আজ তীক্ষ্ণ হাহাকার,
সন্দেহের ধূর্ত অপঘাত।
দিবসের উত্তেজনা, রজনীর গলিত বিষাদ,
জীবনের এই উপহার।—
চেতনার বিতাড়নে বিদ্ধ নীতি-বোধ।
আমি তাই পলাতক স্বপনের পথে।
স্তিমিত ঘুমের ঢেউ-এ মিটে যায় সকল বিরোধ।

নয়নে নেমেছে আজ
বিষণ্ন জ্যোৎস্নার মত তন্দ্রা-কোলাহল।
কল্পনার স্নায়ু কাঁপে মনে।
সুদূর দিগন্তপারে নতুন পৃথিবী এক হয়েছে উতল,
আমার বিহঙ্গস্মৃতি স্খলিত কূজনে
ভরে দেবে তার বনতল॥

অভিনয়-শেষে তাকে

আমার কবিতা রেবা পড়েছ কি তুমি
স্বপ্ন-শোভন মদির নয়নে চেয়ে?
বুঝেছ কী বেদনায় মোর মনোভূমি
বন্ধ্যাধূসর ভাষায় উঠিছে নেয়ে?

অনেক বিপন্ন হাসি হাসিয়াছে তারা
মূর্খ সাহসে হৃদয়েরে ভেঙে চুরে।
যদি সেই শ্লেষগুলি পায় তব সাড়া
লগ্ন-অতীত প্রগাঢ় নয়নে ঘুরে :

আমার কবিতাগুলি রেবা সেইক্ষণে
রুদ্ধ দুয়ার খুলিবে দেহের পারে ;—
কামনার মত তারা জ্বলিবে গোপনে
মত্ত-মদিরা- শিখায় স্মৃতির তারে।

পরিমিত জীবনের মৌন অবসানে
মৃত্যু জানি না কী বাণী শোনাবে চুপে,
পৃথিবীতে যতদিন বাঁচি কাকস্নানে
স্বপ্ন-শোভন হে প্রিয়া ঘুমের রূপে

চুপি চুপি ছেয়ে যেয়ো মোর কবিতায়।
স্তব্ধ নিথর সুরভি ছড়াবে মনে :
আমার কবিতা রবে তারি কণিকায় ;
দীপ্ত আঁধার— জোনাকির শিহরনে।

আমার কবিতা রেবা, পড়েছ কি তুমি
লগ্ন-অতীত প্রগাঢ় নয়নে চেয়ে ?
বুঝেছ কী বেদনায় মোর মনোভূমি
বন্ধ্যাধূসর ভাষায় উঠিছে নেয়ে !

ক্রটিবিধুরেষু

প্রেম-সঙ্কুল গহন চেতনাবর্ত্মে
জটিল ছায়ার বিমূঢ় ঘূর্ণি নামলো।
সাবলীল হাসি আহত বধির স্বপ্নে ;
ত্রস্ত দ্বিধায় কাঁপে গতানুগ দিন কি ?
নিষ্প্রভ আঁখি তবে কি মৃত্যু জ্বালবে ?
অবসিত সেই নাগরিক কারু যাত্রা ?
—হে ক্রটিবিধুর, সংশয় করো ছিন্ন ;
হয়ত দুরূহ, তবু ত্রাণ তারি গর্ভে ॥

২

স্মৃতিসৌধের স্থবিরতা যদি ডুবল
মেঘকেশী ঝড়ে,— এই স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধি
—মনোগত নয় : তবু ঋজু, আর, মুক্ত-
দিও না পিছল ঘৃণা-অপঘাতে মরতে।
তুঙ্গ-শোকের তির্যক দাহ বন্ধুই ;
কৃপণ পাথেয় পোড়াবে প্রাচীন দুর্গে ;
হয়ত ভাঙবে ছায়া-নীহারিকা মূর্চ্ছাও।
হে ক্রটিবিধুর, সংশয় করো ছিন্ন ॥

স্বদেশ

ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি হে স্বদেশ,
প্রণাম। শতাব্দী শেষ
বিহ্বল দিগন্তপারে, স্থাণু জনতার
স্নায়ুজালে— ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে। জাগে স্তম্ভিত মাটির
দলিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।

দম্ভের প্রাসাদচূড়া হ'তে
নিপিষ্টের বঞ্চিতের পুঞ্জীভূত বেদনার স্রোতে
যাহারা দেখেছে শ্লেষে মেখলার প্রায়
পিশাচ বাতাসে ঘোরে সে-কলঙ্ককরুণ অধ্যায়।

স্বর্ণরশ্মি দিবসের উচ্চকিত গতি
মর্মরিত জনারণ্যে আনে আজ সবুজ উল্লাস।
যুগান্ত-তোরণপথে জয়যাত্রা। শ্লথ পাশ
জীবনের, জড়তার।
হে স্বদেশ, প্রণাম আমার॥

একচক্ষু

তরঙ্গের তিমিরলেহন
জ্যোতির্ময় তটরেখা করে নির্বাপণ।
এখন দুস্তর রাত্রি, যাত্রীমন স্তম্ভিত নিথর।
সমুদ্যত আকাশের নক্ষত্রনিকর
মৃতের শিয়রে জ্বলা প্রদীপের প্রায়
সারি সারি ম্লানচক্ষু এ-নিশ্চল অন্তিম ধরায়॥

ছায়া পড়ে :
অন্তরে অন্তরে স্বচ্ছ চিন্তার শিখরে,
অকলঙ্ক চৈতন্যের তপননিন্দিত শুভ্রতায় ;
ছায়া পড়ে স্নায়ুতে শিরায়।—
সেতুর বিধ্বস্ত পথে অভিযানে গহন নিষেধ।
অন্ধকারে সঞ্চারিত মৃত্যুর কবন্ধকণ্ঠে পুঞ্জীভূত খে
পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে ভয়ঙ্কর, অবিরত ঝরে।
জীবনের উপত্যকা ছায়
যোজনদীর্ণ প্রলয়ের বিরাট পাখায়।

ছায়া পড়ে স্নায়ুতে শিরায় :
কালের প্রবাহ আর আমার ভিতরে ছায়া পড়ে ॥

স্বার্থের কঙ্কাল হাতে
সহজ জীবন হ'তে আপনারে করেছি পৃথক।
একচক্ষু কাপট্যের এ-করুণ স্থির অপঘাতে
পণ্যাশ্রয়ী সভ্যতার তরণীরূপক
সাগরশৈলের শিরে পায় জলাঞ্জলি।
আমার ভোগের মেদে বঞ্চিতের সুর্যক্ষুধা উঠিয়াছে জ্বলি,
আমার জ্ঞানের গর্বে শতাব্দীর অন্ধকার পাকায় কুণ্ডলি,
আমার শান্তির স্বর্গে হানা দেয় অভাবের কীটদষ্ট ধূলি,—
স্ব-রচিত এ পৃথিবী ঘুরিতেছে আমারই মাথায়।
উৎকেন্দ্রিক তার সাধনায়
হায়, হতভাগ্য আমি, নাভিচ্যুত গ্রহের মতন
ভ্রান্তির বিমূঢ় শূন্যে করি চংক্রমণ ॥

তথাপি ছিলাম আমি প্রথামত আত্ম-সচেতন,
প্রাণপণ যত্ন ছিল শান্তিকামী হৃদয়ে তখন।
মাটি ও যন্ত্রের মুষ্টি যাহাদের করে নিষ্পেষণ
খাঁটি বিশ্বপ্রেমিকের মত
তাদের বেদনা মোর বর্ষাকাব্যে করেছি চিত্রিত ;
জনসভা, ধর্মঘটে করেছি সতত
সাম্যের অনন্ত সুখ আমিও কীর্তিত।
আমারো তুরঙ্গ তর্ক শুনিয়াছে রেস্তরাঁর বহুবিধ পানীয় আহার ;
হয়ত আমারো পিছে নরদেহী অন্তর্যামী করেছে বিহার।
কিন্তু হায়, মনে মনে তবু আমি জানি,
ছিলাম একান্ত স্বপ্নে স্বার্থের সন্ধানী।—
সেই গ্লানি দগ্ধ করে অক্ষম ধিক্কারে,
সেই ক্লিন্ন পরাজয় প্রেতনৃত্য করে চারিধারে।
মোর অগ্রগমনের পথে

সংস্কার করেছে গ্রাস অভিশপ্তচক্র-কর্ণরথে।
ছায়া ফেলে শুভেচ্ছার মানস ভাণ্ডারে মোর জন্মগত ঋণ।
কালস্রোতে অন্ধ, মরি একচক্ষু নির্বোধ হরিণ ॥

আমারে কে করিবে উদ্ধার ?
স্বচ্ছন্দবিহারী আমি, আজি দেখি ব্যাধের শিকার।
হে সান্ধ্যতপন, বল এ রাত্রির কবে-উন্মোচন ?
মৃত্যু আসে গভীর গহন,
আমার স্মরণে নামে হিমশিলা দুর্জয় প্রপাত,
কে পারে রোধিতে এই ক্রুদ্ধ অপঘাত ?

অসম্ভব। এ-দুর্যোগে নেই অব্যাহতি।
আমারে টানিছে মোর আত্ম-অসঙ্গতি।
বৃথা আর্তনাদ, বৃথা কৃপাভিক্ষা, স্তব :
কণ্ঠে মোর জড়ায়েছে বিগতের স্বার্থপুষ্ট শিলীভূত শব,
পাতালের শব্দ আসে কানে।
তরঙ্গের খরজিহ্বা হিরণ্ময় সান্ধ্যকূলে হানে
তমিস্রার বৃশ্চিক প্রলেপ। দিন
মুছে আসে। মুক্তপক্ষ সর্বনাশ শবরের শায়কে উড্ডীন।
ভগ্নজানু এ কালের উজ্জীবন-সম্ভাবনাহীন
নির্বাত বুদ্ধির শূন্যে একচক্ষু পলায়নে মরি মূর্খ বিভ্রান্ত হরিণ ॥

নবচতুর্দশপদী

(অংশ)

১

সূর্যাস্ত-বন্দরে স্তব্ধ বণিক-মাস্তুল।
নিরুপায়, বদ্ধ হ'ল আদায় উসুল।
সন্ধ্যার জাহাজ যেন পিশাচের বাসা।

পরাশ্রয়ী শকুনির জাদুকরী পাশা
ভাগ্যের খেলায় ভ্রান্ত। যুক্তির কুয়াশা
পথচ্যুত আপনারি গোলকধাঁধায়॥

নিভেছে ইঙ্গিত আলো পথের মাথায়।
হর্ম্যচূড়া মুহ্যমান ত্রস্ত আশঙ্কায় :
আগত দুর্যোগ, ঘোরে প্রগতির চাকা॥

উজ্জ্বল অতীত হ'ল আকব্বরী টাকা।
ইষ্টনাম ব্যর্থ, ব্যর্থ নোঙর পতাকা।
বন্দরে নিঃশঙ্ক যত বিদ্রোহী খালাসী॥

আলোড়িত অন্ধকারে মৌন অট্টহাসি।
আগত দুর্যোগ, ঘোরে প্রগতির চাকা॥

২

হব না পথের কাঁটা প্রিয়, কদাচন :
মনে মনে এই ভিক্ষা করেছি যাচন।
ঘৃণার অতলে হোক প্রেমের কবর॥

আমারে শিকার করে দেহের শবর
কামের তূণীর হ'তে। পাইনে খবর
ইন্দ্রিয়-পরিখা-পারে তোমার পথের॥

তবু আমি রজ্জুধারী ও রম্য রথের
হ'তে চাই। কারুজীবী নবজগতের
হে প্রিয়, আমারে কর। এ শূন্য শরীর

পারে না ভরিতে আর গন্ধ কবরীর :
জীবনের পদশব্দে হয়েছে অস্থির।—
প্রেম মোর ব্যক্তিস্বত্ব করেছে নীলাম॥

তোমার বলিষ্ঠ হাতে এ দেহ দিলাম।
ঘৃণার অতলে হোক প্রেমের কবর॥

বাহির পথের হাওয়া ছুঁয়েছে শরীর।
ছেড়ে যাই শ্বাসরুদ্ধ এ দুর্গ স্থবির।
বাতাসে শুনেছি শব্দ দূর সমুদ্রের॥

শোণিতে জ্বলেছে বহ্নি লেলিহ রুদ্রের,
ভেঙেছে প্রাকার। মুক্তি : আত্মহ ক্ষুদ্রের
শতপাক হ'ল শ্লথ। ছুঁয়েছে বাহির।

কলঙ্ক আবরি দম্ভ করেছি জাহির
ও দুর্গে। এখন, বন্ধু, এ পথবাহীর
সে ছলনা অর্থহীন,— হয়েছি আকাশ॥

এখন হৃদয়ে, প্রিয়, সারল্যের চাষ।
অকুণ্ঠ আনন্দ পিঠে জানাবে সাবাস।—
জনতার যৌথপথে হয়েছি উধাও॥

ক্ষুধিত জিজ্ঞাসা যত পথেরে শুধাও।
বাতাসে শুনেছি শব্দ দূর সমুদ্রের॥

সপ্তপদী

টবের ফুল

তাম্রসন্ধ্যা-নয়নে তোমার উত্তাপ কোথা পাই?
পরিচর্যা ও আদরে যদিও হয় নাকো মোটে ভুল।
বন্দী মাটিতে গুটানো শিকড়, জীবনের সাড়া নাই।

তেতলার ঘরে ছায়া দিল শুধু চিন্তার কালো ঝুল।
আমার এ গানে হৃদয়ে তোমার জোয়ার এল না তাই।—
আবেগনিথর কপালে জমেছে শিথিল বেণীর চুল;
মুখোমুখি চাওয়া তুমি আর আমি,— শীর্ণ টবের ফুল।

টাওয়ার ক্লক

আমারি নিয়মে সূর্যের বাঁধা দ্রাঘিমা-পর্যটন।
ইস্পাত-হাতে ক্ষমাহীন আমি সময়ের জট খুলি।
ছুটি ক্ষয়ে-যাওয়া সৈন্যের যদি কাঁদে তো কাঁদুক মন,
কেরানীর বউ থাকুক গলিতে ব্যস্ত নয়ন তুলি'—
আমি দৃঢ়, করি কাংস্যকণ্ঠে সত্য-উদ্ঘাটন!
সবই ছিল ঠিক, হঠাৎ বাজারে এল হাতঘড়িগুলি,—
ভাঙা ফটকের দেয়ালে এখন বুর্জোয়া হয়ে ঝুলি।

রাত্রি ও রেবা

হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমনিলয়,
হ'লো কি সাঙ্গ পৃথিবী জয়।
স্নায়ুতে তোমারই সুরভি বয়
যাচে তোমারেই মর-হৃদয়,—
হে প্রিয় রাত্রি, প্রেমনিলয়।

এখনো কি, এখনো কি জেগে আছে নিদ্রাহীন রেবা
তোমার তুহিন বক্ষে, হে রাত্রি আমার,
মূঢ় প্রতিবেশিনীর চিত্রার্পিত বাতায়ন-বিলাসের মত।
এই স্তব্ধ মর্মরিত অগাধ উদ্ধত

স্মৃতির বৃশ্চিকবন্যা তাহারে কি স্পর্শ করে ? ত্রস্ত করে
নয়ন তাহার—
বল বল হে রাত্রি আমার,
এখনো কি, এখনো কি জেগে আছে নিষ্পলক রেবা।

স্নায়ুতীরে যেন বুদ্‌বুদ্‌ প্রায় উঠিছে মুখ :
শ্রান্ত, কোমল, ঝঞ্ঝা-পীড়িত, কি উৎসুক।
কারো আছে শুধু বিদ্রূপভরা শূন্য বুক,
কারো বা মেদুর স্বপ্নের মত নিরীহ-মুখ,
ডোবে আর ভাসে— ভাসে আর ডোবে— উথলে বুক
তবু তারি মাঝে রেবার নয়ন কী উৎসুক !

জানি জীবনের নীতি-বিশারদ সভয়ে
নিরাপদে যাবে বিদ্রূপ হেনে। টানবে
গড্ডলিকার মৃদু যুথে। দিগ্‌বলয়ে
আমার সূর্য তবু নব উষা আনবে।

জানি, আমি জানি,
প্রেমধ্বজ জীবনের মেরুদণ্ডহীন ঘৃণ্য গ্লানি
আত্মার অগ্নিরে করে নিরন্তর স্তিমিত, অস্থির,
নিরুত্তাপ। জানি পৃথিবীর
নির্ধারিত কক্ষপথে উন্নতি, উচ্চাশা, শান্তি, সুখ-
তারো চেয়ে সুনিশ্চয় সমাজের প্রহরা কৌতুক।
জানি, তবু জানি

সূর্যের ঔরসে আর ধরিত্রীর গর্ভে যার বাণী
সে নহে নিশ্চিত শান্তি,— ত্রস্ত ক্ষুব্ধ জলন্ত উধাও
সে চির অবাধ্য প্রেম। তারি বীর্যে পাও
লেলিহ আত্মার বহ্নি, তীব্র অনুভূতি;
তোমার স্নায়ুতে রক্তে জাগে তারি প্রজননদ্যুতি।
চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে তারি রুদ্ধশ্বাস নাম,
'হে প্রেম, আত্মার অগ্নি,— জন্মান্তরে কাম।'

রাত্রি যায়, রাত্রি যায়, ক্ষীণ হ'ল আঁধার-উৎসব।
পৃথিবীর প্রান্তে যেন ভেঙে পড়ে আলোর অসহ্য কলরব।
আরো গুটিকত পল, দণ্ড দুই পারো না কি দিতে
আসন্ন-জাতক এই দিবসের আয়ু হতে একান্ত নিভৃতে
আমার রাত্রির ভাণ্ডে স্মৃতিগর্ভে অশ্রুর মতন,
অনাগত হে সূর্য, পূষন?
রাত্রি যায়, রাত্রি যায়, ঘুমাও ঘুমাও রেবা আজ
ওই দেখ জেগে ওঠে তীব্র আলো বিচক্ষণ বৃশ্চিকসমাজ

রাত চলে গেল, প্রখর আলোয় সঙ্গীহীন
ঘুরি বিষণ্ণ। কথা বেচা-কেনা সারাটা দিন
(শুষ্ক ঘাসের বুকে বাতাসের সঞ্চরণ
মাঝে মাঝে বটে রেবার নামটা করে স্মরণ!
রাত চলে গেল প্রখর শ্মশানে এ মরা দিন।
ঘুরি বিষণ্ণ সূর্যের মতো সঙ্গীহীন॥

অক্রূর সংবাদ

আমি যাই।
নির্বোধ কৈশোরস্বপ্ন আর নয়, ব্রজবাসী, নয়।
এ পৃথিবী রাত্রিগর্ভ, এ জগৎ ডাকিছে বৃথাই ;
কক্ষচ্যুত আমার হৃদয়।
নীরন্ধ্র পেশল দিন অষ্টভুজে টানে। আমি যাই
শোণিতে শিহবে যেন দূরাগত ঝঞ্ঝার প্রলয়॥

গোকুল গোধলিম্লান হবে জানি। জানি, যদি আমি যাই
দগ্ধহাসি জীবনের সে করুণ তমিস্র প্রহর,
বিষণ্ণ যমুনা আর কদম্ব নিথর,
(হায় বিনোদিনী রাই !)
এ রসতীর্থেব শবে ক'রে দেবে নিরুত্তাপ ছাই॥

তবু, তবু আমি যাই।
আত্মরত সুখনীড় আর নয়। নয়
বিচ্ছিন্ন অলস স্বপ্ন, গোচারণ, নিকুঞ্জ-প্রণয়,
(ক্ষমা ক'রো রাই !)
বাস্তবের নখদংষ্ট্রা উদ্যত হয়েছে যেইখানে
সেথায় আহ্বান মোর। দলিতের রক্তস্নাত সে হিংস্র মশানে
আমার জগৎ যেন নবরূপে জাগিবারে চায়।
এ পৃথিবী স্বাদহীন ; এ জগৎ কাঁদিছে বৃথাই।
কর্মঘন উদ্দীপনা উদ্বেলিত স্নায়ুতে শিরায়।
আমি যাই॥

কবিতা

নিদারুণ আত্মকরুণার পরিহাস শুধু। চারিদিকে রুদ্ধশ্বাস ধূধূ বালি, তৃণশস্যহীন। ক্ষুরধার মধ্যাহ্নের নিঃশব্দ আগুন জ্বালে যেন চিতা। নীরস দিনের প্রান্তে তবু লিখি বিরস কবিতা, তবু গান গাই। জীবনের সাড়া তাতে নাই ; রাশি রাশি শ্মশানের ছাই,— গায়ে মাখি, বাতাসে উড়াই।

সে ছবিতে দেখে যারা বিবর্ণ বিলাপ আর মৃত্যুর পিশাচনৃত্যে ধ্বংসের ইশারা, তারা কি জানে না, কবিচিত্তে আনন্দের প্রবাহ বহে না, রৌদ্রদীর্ণ দগ্ধমাঠে সান্ত্বনার কোনো ছায়া নাই ?— কণ্ঠহীন এ সঙ্গীতে তাই ইঙ্গিতের ইন্দ্রজালে শিহরন মরেছে বৃথাই ; মৃতকোষ জীবনের মুকুলিত সকল প্রয়াস পেল তাই শূন্যতার অগ্নিপরিহাস, হ'য়ে গেল একেবারে বৃথা। তারা মানে কি তা ? তাদের লোলুপ দৃষ্টি রূপসৃষ্টি ব্যর্থ করে। মদস্ফীত গৃধ্নু হাতে জীবনের উৎস চেপে ধরে, চরাচরে হানে এক বীভৎস তাণ্ডব। কবির লেখনী মুখে চায় তবু জীবনের স্তব, সঙ্গীতের নবসম্ভাবনা। এ কী বিড়ম্বনা। জীবিতের অধিকারে নির্বিচারে লৌহহাতে ক'রে দিয়ে বৃথা, তারা চায় কালির রেখায় জীবনের বন্দনায় অমর কবিতা।— বশম্বদ হায় রে কবিতা।

গুপ্তচিত্র

চক্রাকার পক্ষছায়া ফাটা মাঠে ঘুরে, চৈত্রের দুপুরে
পানাভরা শীতল পুকুরে ডুবাল তৃষ্ণার্ত ঠোঁট তার।
হ'ল হার সীমাশূন্যে শূন্য জিজ্ঞাসার॥

জলের দর্পণে আঁকা গ্রাম্য ছবি যত, জীবন্ত হয়েছে
ক্রমে প্রাত্যহিক সংসারের মত। দেখেছে অনেক দুঃখ
রুক্ষ দিনে বধূদের ক্ষুধিত বাসনে, চাষীদের মাঠফেরা
সান্ধ্য প্রক্ষালনে ; পরস্পর কুশলসম্ভাষে। তারি বুকে
ভাসে অজন্মার হাড়জ্বলা ছাপ,— সে বছর পাঁচ ছেলে

মেয়ে বউ খাওয়াতে না-পেরে, জীবনের চালে গিয়ে
হেরে, মেধো হাড়ী চুকাতে সন্তাপ তারি তলে খুঁজেছে
আশ্রয়। তারি তলে অবরুদ্ধ রয় ডোমেদের সুশীলার
ভাতজোটা-মাতৃত্বের অসমাপ্ত ক্ষুধার কুসুম। আশ্চর্য
ঘটনা সব এ পুকুরে রয়েছে নিঝুম॥

উত্তর পেয়েছে জিজ্ঞাসার। পাখি হ'ল উড্ডীন
আবার। পেয়েছে উত্তর,— প্রশ্ন ফেরে মাটির ভিতর।
মাটির গহনে আছে অঙ্কুরিত সহস্র উত্তর। পাখি
হ'ল আকাশে উধাও,— ফিরে এল মাটির ভিতর।
তারপর বিদীর্ণ পাথর। কুঠার ফিরেছে বৃথা যার
ঘন নিষেধের দ্বারে, সে কেঁদেছে আজ হাহাকারে
অঙ্কুরের আঙুল ছোঁওয়ায়। জীবনের সাড়া ওঠে
পল্লবিত শ্যামল ধারায়॥

পাখি তার ফিরে পেল নীড়। পুকুরের সকল শরীর
আকাশের নীলে নীলে প্রখর নিবিড়। ছবি ওঠে
নবপৃথিবীর। বর্ণনা হ'ল না তার, কাজ শেষ হয়নি
চিত্রীর॥

প্রত্যাগমন

বৈপ্লবিক চিন্তাজালে পিষ্ট আমি দিবস রজনী।
এ জীবনে শান্তি নেই, নানা ছাঁদে রুদ্ধ অবকাশ।
তবু কেন কেঁপে ওঠে নিপীড়িত আদিম ধমনী,
শীতার্ত বনানী ছেয়ে জ্বলে কেন অবাধ্য পলাশ?

আমি যে বিমুক্ত! নেই পলায়নে সে রম্য আশ্রয়
হৃদয়ের অলিগলি পরিচিত বস্তির মতন
নিরানন্দ ছকে ঘোরে। প্রতিপদে ব্যাহত বিস্ময়।

তবু এ রহস্য কেন স্বপ্নায়িত করে তনুমন ?
কেন আনে আবিষ্ট উল্লাস ? আমার রয়েছে কাজ,
আছে চিন্তা, বিরোধ অনেক— প্রশ্ন সর্বাধিক।
এ দুই জিজ্ঞাসু চোখে জীর্ণ লাগে স্থাবর সমাজ ;
সংগ্রামসঙ্কুল পথে চলি আমি উদ্বিগ্ন পথিক।
আমার বিশিষ্ট মন স্বতন্ত্র স্বপ্নের পরিসর
পায়নি কখনো। তাই প্রেম ছিল বাহির দুয়ারে।
সার্বজন্য আবেগের মিছিলে ছেড়েছি নিজ ঘর ;
জেনেছি সে স্বার্থপর যে খোঁজে একান্ত আপনারে
যুগান্তিক এ দুর্যোগে। তবু আজ এ কি বিপর্যয় !
জাগে মনে বেদনার রোমাঞ্চিত নিবিড় সুবাস।
সীমান্ত প্রবাসী সৈন্য শিবিরে কেন যে জেগে রয় !
রক্তাক্ত প্রান্তরে সে কি স্বপ্নে দেখে আপন আবাস,
প্রিয় পরিজনে ঘেরা প্রত্যাগত শান্তির সুদিন ?
আমার বেগান্ধ দৃষ্টির শুধু অগ্রস্মৃতির নেশায়
গতির সার্থক সীমা কোথা ভুলে ছোটে লক্ষ্যহীন।
জটিল পথের বিঘ্ন টানে যেন দুর্বোধ্য ভাষায়,
মুছে যায় যাত্রাবিন্দু, দূর হতে দূরে চলি ভেসে।
সহসা বুঝি-বা তাই প্রস্ফুরিত হৃদয়ের ফাঁকে
আনন্দিত কিশলয় জেগে ওঠে অপূর্ব উন্মেষে ;
নিবিড় শ্যামল ছন্দে মৃত্তিকার স্নেহবদ্ধ ডাকে
ভ্রষ্টনীড় বিহঙ্গকে। মিশে যায় পৃথিবী-আকাশ
সে নব আশ্রয়-শাখে। সীমাশূন্য স্বাক্ষরের দাবি
শান্ত হয় সে জগতে। জাগে বুঝি তারই পূর্বাভাস ?
জানায়, সকল ধ্বংসে থাকে এক সৃজনের চাবি,
সংগ্রাম নির্বোধ, যদি না থাকে জীবনে ফিরে আসা।
সর্বাঙ্গে শিহর তুলে এ দুরন্ত উল্লাসের সাড়া
জাগায় প্রেমের স্বপ্ন, বিপ্লবের পূর্ণতম আশা।
যেখানে বাহির মেশে, বাহিরে যে ঘর পায় ছাড়া,
হে দৃঢ় গহন মুষ্টি, দিলে কি সে মুক্তির ইশারা ?

ঘুড়ি

হে আকাশ, তোমার হৃদয়
কে কবে করেছে জয় ?
অবাক মানুষ তবু, সামান্য সে, অসামান্য আশা
খোঁজে দিন নীল শূন্যে ভাসা।

যতটুকু অবকাশ, হে আকাশ, দূরে ঐ যুবকের মতো
বিহারী মুচির ছেলে, ঘুড়িহাতে আকাশে সংহত
কর্মক্লান্ত একান্তের ছুটি
ভরে মুক্ত লাটাইয়ের মুঠি।
দিন তার শিরদাঁড়া বাঁকা নতচোখে
পাদুকার পরিক্রমা টানে মৃত্যুলোকে।
ছেঁড়া-খোঁড়া জোড়াতালি
হাতুড়ি বাটালি,
সেলাই মোমের পাকে সুতো,
নেহাইয়ের কুঁজে কাঁটা, লাশে-আঁটা জুতো,
বহু যাতায়াত, বহু বেদনাসুখের ইতিহাসে
সারাদিন ভিড় করে আসে।
মেলে তারা রিক্ততার বিচিত্র পসরা,
অকালবার্ধক্য আর জরা,
পদক্ষেপে ঘেরে যতো অলিগলি প্রেমের প্রাণের মৃত্যুঞ্জয়
ক্যাশানে র‍্যাশানে ; দাঙ্গা শান্তির উভয়
বিপরীত আচরণে,
উত্তেজিত মুখে ক্লান্ত মনে,
মধ্যবিত্ত রিক্ততায় ঋণী
মেলে ধরে আজন্মের ক্ষতির কাহিনী।
তালির কাঙালী ছাপে কালির পালিশ
একে একে ভোলায় নালিশ,
ফিরে যায় গোঠে

নধর মসৃণ ধেনু। মাঝে মাঝে চোখে ভেসে ওঠে
জুতোর বিজাতি ভিড়ে হয়তো বা আপনার গ্রাম
কোন দূর পরগণার তশিলে হারানো এক নাম।
রঙীন ঘাঘরা তার ভাঁজে ভাঁজে লাল
মাটির মাঠের ঢেউয়ে নদী হাসে রূপোর হাঁসুলি,
সবুজের বনে নীল পাহাড়ের বুকের কাঁচুলি
কল্পনার জালে বোনা, স্মৃতির সোনায়
কী স্বচ্ছ প্রবাসী বেদনায়।
উন্মূলিত মানুষের হৃদয়ে সে স্মৃতি ডালে ডালে
অঁকিড়ের দুঃসাহস জ্বালে।
দিনান্তে সন্ধ্যার বুকে নামায় হাতুড়ি,
তুলে ধরে দীপ্ত রাঙা ঘুড়ি।
কলিজার রক্তেভেজা মুহূর্তের সে মুক্তিমহিমা
আকাশ, তোমারো ভাঙে সীমা॥

পঞ্চাশের প্রেত

শুধু কি দেখেছ ধ্বংস পেটে-হাত পথের যাত্রায়?
হাড়ের হাপরে শুধু ওঠাপড়া মৃত্যু দেখ তুমি?
ফাটা মাঠে কালসূর্য আকালের দিগন্ত নাচায়?
দেখ না হরিৎ স্বপ্নে গুরু-গুরু আশার মৌসুমী!

কবরের অন্ধকার জানি আজো দুর্ভিক্ষের দেশে।
অমৃতদুর্লভ জানি পিলেভরা পেটের কুইনীন।
অনেক এরণ্ড-নেতা বেপরোয়া স্বার্থের নির্দেশে
গৃহস্থে সজাগ আর চোরে চুরি মন্ত্রণা প্রবীণ!

দিনান্তে কাঁকর অন্ন, (চোখে ভাসে হাওড়ার ময়দান!)
ঠাঁই নেই পথে, ঘরে। যাই খোঁজো, শামুক বাজার।

বিলোল নিশীথে আছে জঙ্গী ট্রাকে পণ্যের সন্ধান ।
জানি। তবু পাথরেও কাঁটাগুল্মে জীবন নাচায় ।

এ জীবনে মৃত্যু নেই। সমুদ্রের তরঙ্গ আঘাত
বারে বারে ভেঙে পড়ে মৃত্তিকার বসতি-বেলায় ।
মৃত্তিকা তো ক্ষয়হীন। ভাঙে যদি, গড়ে অন্য হাত।
একছড়া বীজধানে কত কাঠা প্রাণের গোলায় ।

চেয়েছ সাজানো ছকে রাত্রিশেষে উদয় অচল ;
দুইঢেউ পাহাড়ের নীল বুকে লালের ফোয়ারা।
সহজ মুক্তির লোভে তাই তুমি মড়কে বিকল ।
দেখো না এ পোড়া মাঠে হাঁটে ক্ষুব্ধ কিসের ইশারা ?
অদূর সে জন্মসত্রে পঞ্চাশের প্রেতও পাবে ছাড়া ॥

গাঁতা

কঠিন শোকার্ত মাঠে কোথা সেই ফসলিয়া ঢেউ !
উপবাসী মাঠ এই, এখানে কে দিল দ্বীপান্তর ?
এদের জানি না কিছু ; আমাকেও চেনে না তো কেউ
কথার বেসাতি করি, এ যে দেখি কাজের বন্দর।

এখানে লাঙলমুখে বিদীর্ণ যে ভাষার যন্ত্রণা
যাচে এই বন্ধ্যা মাটি, সে চাওয়ার তর্জমা কোথায় ?
কী তুচ্ছ এখানে লাগে সাধা-স্বরে প্রাণের বন্দনা !
খামারে তো প্রাণ কাজে, গানে প্রাণ শহুরে কোঠায়।

তবু তো আপন স্বার্থ ক্যাঙ্গারুর উদর-কোটরে
চকিত ভয়ের শব্দে নিরাপদে দিল না আশ্রয়।

-শয্যার সমুদ্রে ভেসে নাবিকের আমগ্ন প্রহরে
সুরভি দেহের দ্বীপে মেলে কোথা প্রাণের সঞ্চয় !

দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে কালের কয়েদী আমি ঘুরি।
সাবেকী আয়েস নেই গিলে-করা পাঞ্জাবিতে, পানে ;
বেপরোয়া শান্তি গেছে, জমে না সে হাই-তোলা তুড়ি।
অথচ শিকড় সরু, আঁটে না কঠিন বর্তমানে।

খুঁজেছি সাহস তাই, যেন এই হারানো জগতে
কাজের গাঁতায় মিশে ভরে দিই কঠিন খামার।
জীবনের খুশি নাচে ধানঢেউ সবুজের স্রোতে।
সবুজে অবুঝ মন ! কথাকাজে খেয়া-পারাপার
রেখে যাবে এ জীবনে ভারমুক্ত যা কিছু আমার।

পদ্মার পাড়ে— মেঘের পাড়ে

মেঘে চাপা এই সূর্যের ছটা মেঘের পাড়ে
জরির আগুন জ্বালায়, আবেগ জমায় মনে।
আঁকাবাঁকা-রেখা উধাও পদ্মা যেমন কাড়ে
ভাঙা পাড় থেকে ঢালু চরে তার আপন জনে।
এখানে আমরা কালীঘাটে, কেউ এসপ্লানেডে
দু-চার পয়সা নাছোড়বান্দা দিয়ে কদাচিৎ
মনে খুশী ঘরে ফিরেছি, ভাবি নি এরাই খেটে
ঘর তোলে, আর এরা না খাটলে ভাঙে তার ভিত।

পিচঢালা নীল পথের ধমনী শহর ছেড়ে
লালপথে যদি গ্রামে যাই, তবু মানবতার
বিলাস মড়কে ছেঁকে ধরে, কালো গ্রহের ফেরে
নীল রাতে সাড়া পাইনে উদয় লাল পতাকার।

করুণার হ্রদে গতি নেই। হাওয়াহীন বিকেলে
চলে শৌখীন দাঁড়টানা কিছু, তার বেশী নয়!
কালো-ঝড়-গাঙে মোচার খোলায় তুফান ঠেলে
হাটের নৌকো পাড়ে নেওয়া জানি তার পেশী নয়।

তবু জানি তারা আসবে হাজারে, কালো মেঘের
বেনো জল ভেঙে খেয়া নেবে যারা সবুজ পাড়ে।
তারা জালে ঢালু পদ্মার রেখা। ঘোলা বেগের
বুকে হাসে চর সবুজের ঢেউয়ে, তাদেরই হাড়ে!
জরিজলা রেখা তারা আমাদের মেঘের পাড়ে॥

সন্ধ্যা

দুর্যোগের দিনশেষে গ্রাম্যপথে সন্ধ্যার লোহিত
গাছের পাতায়, ঘাসে, খড়ো চালে মানুষের মুখে
ক্ষণতরে রেখে যায় প্রাতঃসূর্য আশার সম্বিৎ।
যদিও দুস্তর রাত্রি কালিঢালা রয়েছে সম্মুখে
এ রক্তনিশান ক্রমে নেমে যাবে অন্ধ অস্তাচলে ;
আকাশে রাত্রির বন্যা ছেয়ে যাবে মৌন মগ্নতায়
মুখর হৃদয়, আর শ্যামারুণ দীপ্ত বনস্থলে ;
যদিও দুর্যোগশেষে ক্ষণস্থায়ী দিগন্ত আভায়
তামাটে মুখের শীর্ণ হাসি ডোবে ঊর্ধ্বে তুলে হাত
রাত্রির জোয়ারে, আর, দিন কত দূরে তা কে জানে!
তবু এই সন্ধ্যাকাশে ক্ষণতরে শুনি পদপাত
আগন্তুক সে-দিনের, বেগরক্ত অদৃশ্য আহ্বানে।
বুঝি তাই মৃৎপ্রদীপে রক্তরশ্মি আশা জেলে রাখা।
রাত্রিমুখী ঝোড়ো কাক ডালে বসে ঝাড়ে সিক্ত পাখা।

প্রস্তাব

প্রেমমুকুলিত কৈশোরে কবে প্রজাপতির
পেছনে ছুটেছি বর্ণমাতাল, ফুল থেকে ফুলে ;
কবে নিজে প্রজাপতির আসনে নবযুবতীর
চোখ ছুটিয়েছি, মন ফুটিয়েছি, গিয়েছি ভুলে।

আবেগ এখন কাঁপায় এ-মন তুরঙ্গ নয়—
ভাঙা ঝরঝরে ট্যাক্সির মতো, গতির চাপে
অপটু শরীরে বিক্ষোভ যেন। ভীরু প্রণয়
উধাও। নিটোল বিজ্ঞ ও বাঁকা হাসির মাপে
মেপেছি হৃদয়— শাদা জল দিতে যে ভদ্রতায়
গয়লারা দুধ মাপে, ফাউ দেয় ; চুপচাপ দেখি
যে অক্ষমতা বুকে চেপে ; আর যে তুচ্ছতায়
চার আনা দামের একটাকা হারে একশ মেকি
টাকার বেতনে ভদ্রতা ঢাকি ;— সেই আবরণ
কালো পর্দায় ঢেকেছে সদর অন্দর। তাই
প্রেমের চাহনি আনে না পাওয়ার জাদুশিহরন।
ভিড়ের যাত্রী, চোখে-চোখ-রাখা কথাকে ডরাই-
চমকাই— যেন আয়নায়-ছোঁড়া রৌদ্রঝিলিক
ছিঁড়ে দেয় ভিড়ে চলার গড্ডলিকার দড়ি।
ছত্রভঙ্গ স্বাধীনতা তাই লাগে যে অলীক !

পুরনো দিনের তরল প্রেমকে স্মরণ করি।
চোখে-চোখ রেখে যখন ভাষার স্বপ্নসেতু
জড়াতো হৃদয়-মনকে, যখন কালের মাপে
বাঁধা পড়ত না গতিতুরঙ্গ সে মীনকেতু,
কোথায় সেদিন ? দলিতদ্রাক্ষা প্রেমের চাপে
কাঁপত যেদিন, জ্বলত যেদিন প্রজাপতির
অন্ধ আবেগে ? হায়রে. সেদিন গিয়েছি ভুলে।

এলে কি তুমি সে সোনার চাবিটি অমরাবতীর
হাতে নিয়ে? নয় অতীত স্বর্গ, দাও তো খুলে
ভবিষ্যতের পাহাড়িয়া পাকদণ্ডী পথে
নতুন বসতি গড়ার সাহস। তোমার প্রেমে
শিকলতোলা এ হৃদয়ে নামুক হাজার স্রোতে
পথিকের ধারা। আসে যেন পথ দুয়ারে নেমে।

তোমার মনের চাবিতে খুলবে মনের কপাট।
রুক্ষ বন্ধ্যা মাটিতে যেমন মেঘের জলে
জীবনের সাড়া শ্যামসমারোহে ভরে দেয় মাঠ.
সুস্থ প্রেমের আবেগে তেমনি উঠবে ফলে
কাজের স্বপ্ন। প্রাণযাত্রার অন্নজলে
দলিতদ্রাক্ষা প্রেমে দেখা দেবে ফসলের হাট॥

লিখন

স্বপ্নে আমাকে ডেকেছে যে-জন পাহাড়িয়া মেঘনীলে
কুয়াশার ধোঁয়া ঝরা-পাতাঘেরা ছায়াবীথি যাত্রায়,
বুঝি তারই ছায়া হেলঞ্চঘন পদ্মপাতার বিলে
শ্যামাঘাস ভিড় ঠেলে ভেসে ওঠে শারদীয় জ্যোৎস্নায়।
গোধূলি নদীর পানি-ভরানিয়া ঘাটে ঘোমটার ফাঁকে
কৃষাণীর চোখে স্বর্ণকুম্ভ-সূর্যের উপহার
যে-জাদুমন্ত্র রচে তারই মাঝে পাওয়া যাবে বুঝি তাকে,
ধানের সবুজে প্রেমের আবীর সে আকাশে একাকার।

এতো কাছে, তবু তাকে পাওয়া ভার। শিশিরের মতো জলে
ক্ষণতরে তার কৌতুক, মাতে মাহ ভাদরের বানে।
চৈত্রদিনের মাঠে মাঠে তার বেহিসেবী খেলা চলে,
ঘূর্ণি ধুলোয় ঘুরে ঘুরে ছোটে কোন্ মরীচিকা টানে!

জেনেছি, এ-জনে সহজে পাব না স্বপ্নের মতো ক'রে।
স্মৃতির দেয়ালে রেখা টেনে তাই স্বপ্নেই রাখি ধরে॥

সাঁওতালী সন্ধ্যা

সারাদিন ঢাকা বৃষ্টির ধোঁয়া, নীল ওড়নায়
জরি কুচি কুচি ঝরে, মুছে যায় দৃষ্টির সীমা।
হঠাৎ সন্ধ্যা-উপকূলে যেন হাওয়া মোড় নেয়!
সূর্য ফিরেছে যে দ্বারে ব্যর্থ, রাতের মহিমা
খুলেছে কপাট, কাঁপে সমুদ্র সে নববধূর
উদ্বেল শিরা উপশিরা লাগে ঢেউ করতালি।
মুদিত প্রেমের চোখে বাঁধা দূরে চন্দ্রমুকুর,
চুলের আঁধারে জ্বলে একে একে তারার দেয়ালি।
রাত্রিদিনের সন্ধি। রাত্রি দিনের মাটিতে
জোয়ারের মতো ভেঙে পড়ে, রাঙা রাত্রি আমার
ছড়ায় সোনার আঁচলে, হালকা মেঘের শাড়িতে
জড়ানো চিকন দেহ, থরোথরো যৌবনভার।
ফেরে তামাঘট মাথায় ঘরকে লালপথ বেয়ে
মাত্রাছন্দে ঘুরে ঘুরে একা সাঁওতালী মেয়ে॥

শীতলাই

এই স্বাধীনতা, অনেকদিনের কামনা আমার!
হাজার মৃত্যু ভস্মশ্মশানে গঙ্গা নামে?
লাখে লাখে লোক কাতারে কাতারে এ কলকাতার
উদ্বেল ঢেউয়ে ভাসে, খুঁজি তব আপন গ্রামে।

চলন বিলের ভূঁইঞা সেখানে হাজারদাড়ি
ছিপে বিদ্যুৎ লাঠি লাল জল। টোডরমল্লের
জরিপে সেলামী থেমে গেছে। জাগে নতুন দিয়ারী-
শীতলাই, চাষে সোনার ফসল! খাসমহলের
চোরাপথে ক্রমে শকুনিনথর আংরেজ আসে।
ঘুমপাড়ানিয়া গানে বুলবুলি খেয়ে গেল ধান,
হা অন্ন এই চুয়াত্তর যেন ডাকে পঞ্চাশে।
সেখানে কোথায় স্বাধীনতা, এই আনন্দ গান?

কলকাতা কাঁপে পদভবে, পথে আমিও মিলাই।
নগ্ন ন্যুব্জ গ্রামে গ্রামে তবু জ্বলে শীতলাই॥

পরিচয়

কত রেখা কত রঙের তুলিতে তার
ভাঙাগড়া, জমে নানা আবেগেব স্মৃতি;
মিলনের পথে যতো বাধা, যতো হার,
শত-পবিচয়-বাঁধনে ততোই জিতি।

কখনো দীঘির নীলজলে তুলে সাড়া
খুশী তার নাচে কল্‌মি ফুলের লালে;
সন্ধ্যার মেঘে একাকী সঙ্গীহারা
ব্যথা মেলে শিরা করুণ নিমের ডালে।

উনুনের আভা আধো-ঘোমটার নিচে
যে মাধুরী আঁকে, সে তারই পবিত্রতা,
বেঁকে গেলে পথ বটতলা ক'রে পিছে
সে মোড়ে রয়েছে তারই বিস্মৃত কথা!

রুক্ষ হাতের বুনানিতে সোনা ধান
যতো আশা দেখে বৃদ্ধ চাষীর চোখে,
বীজের জঠরে জাগে যে মাটির টান
তাকে পাওয়া যাবে সেই রহস্যলোকে।

ভাঙনের স্রোতে নদীর দীর্ণ পাড়ে
সৃষ্টির রসে তন্বী চরের বুকে
মেঘে চাঁদে তার লুকোচুরি মন কাড়ে,
বেঁধেছে আমাকে স্বপ্নের কৌতুকে।

যত খুঁজি, যেন ততই হারাই তাকে।
বন্দী হৃদয় পায় না এ প্রেমে শেষ!
জড়িয়েছে দেখি শত জীবনের পাকে
অসূর্যের আবেগে আমার দেশ॥

যাকে চাই

যাকে চাই সে তো এক নয়, খুঁজি তাই নিশিদিন,
মিশি মেলাহাটে, কপাটের খিলতোলা ঘরে ঘরে;
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার গানে সুর বেলাবালুকায় লীন,
রেখায় চূড়ায় মিনারে মিনারে নীলমুঠি ধরে!

পিদিমের শিষে লালের কালিমা, ছায়া কালো-কালো
ছায়া ঘোমটার টানে রাঙে মন, রঙ ঝিকিমিকি
সন্ধ্যার লালে নীল ঝিলিমিলি পাতায় মিলালো,
আনত হিজলে ভেজা হাওয়া কাঁপে, খুশিভরে দীঘি
শিহরে সবুজ ঢেউয়ে, পাড়ে পাড়ে ঘাসের শিথানে
ঘুমপাড়ানিয়া দোলা লাগে, খোলে রূপসীর চুল

হঠাৎ প্রেমের জোয়ারে, কোমরে, বাহুর খিলানে
বুকে মুখে টানাচোখে ক্ষণিকের কালের পুতুল।

যাকে চাই, শত উর্বশী পলাতকার বেশে
স্খলিত আঁচলে স্মৃতি তার সারা বাংলাদেশে॥

কেন-যে হৃদয় ভুলে

কেন-যে হৃদয় ভুলে বারবার ঘুরি অন্যমনা
ভিক্ষার দরিদ্রবেশে, কেন-যে এখনো স্বপ্নসাধ
সাজায় তোমাকে রত্নে (ভুলে পরকীয় সে গহনা
প্রেমের অযোগ্য !) কেন প্রতিদিন চৌর‍্যঅপবাদ
মানি, কেন এ-কাঙাল মন স্বকীয় রক্তের বীজে
জন্ম দিতে পারে না সে তরু উর্ধ্বে যার মহাকাশ
রৌদ্রস্নাত নীল, নিম্নে যার মূল স্মৃতির খনিজে
মগ্ন, মুহূর্তে মুহূর্তে সূর্য-ও-মাটিকে যে প্রয়াস
পাতার মুঠিতে বাঁধে, মেলে দৃপ্ত সৃষ্টির রাগিণী
সবুজ প্লাবনে, আহা, কেন সেই প্রাণের আদিম
বিদ্রোহের অলঙ্কারে হে প্রেয়সী তোমাকে বাঁধিনি,
বাজেনি সর্বাঙ্গে কেন শ্যামাগ্নির সে রুদ্র ডিণ্ডিম

এ আমার অক্ষমতা। বালুভাঙা হৃদয়ে ধুতুরা—
নাও তাই। ও-বসন্তে দেব রক্তফাটা কৃষ্ণচূড়া॥

আদিম-চাষী

দরবারী রাতে নেভে তারাজ্বলা ঝাড়লণ্ঠন।
মিলায় জ্যোৎস্না চাঁদোয়া-ঝালর, মখমলছায়া
ঘরানা রাত্রি খোলে ওড়নার অবগুণ্ঠন।
স্মৃতির পাতালে কামনাঝিল্লী হারায় মায়া।
নেই সে রক্তদোলায় জোনাকি-জরি-পেশোয়াজ ;
আততায়ী প্রেম নেই, মসনদে কিংখাব-ছুরি ;
গুম খুন, হাসি, ফটকে-গলিতে সে কুচকাওয়াজ ;
কবরের ভিড়ে চাঁদের কাফন ঢাকে না চাতুরী।

মুক্তি মুক্তি ! হাওয়ার ঝরনা ঢালে অভিষেক
স্বর্ণঝারি উষার আকাশে। মুছে যায় ছল।
ভেসে যায় যতো শাসনে-ব্যসনে সুরঙ্গবাসী
সভাসদ বিদূষকের ভাঁড়ামি, খানদানী ভেক।
নামে জীবনের মাঠে কাঁধে নিয়ে রোদের লাঙল
সূর্য—কৃষির দেশে বিদ্রোহী আদিম চাষী॥

এখনি এখানে

এখনো অনেক বাকী ?

এখনো অনেক
দিন আর রাত্রি যায়, রাত্রি আর দিন !
চারিদিকে গুপ্তশত্রু রক্তহীন মৃত্যুর জহ্লাদ
র‍্যাশানে কাঁকরব্রহ্ম ; বসনে কৌপীন ;
দিন আর রাত্রি যায় ; রাত্রি আর দিন।

এখনো অনেক
কর্তারা বক্তৃতা পড়ে পত্রিকায়, শেয়ার মামলায় ;
গিন্নিরা রেডিও খুলে পরচর্চা ফাঁদে ;
বাবুরা আপিসফের্তা ট্রামের জানালা থেকে দেখে
ময়দানে মিটিঙের ভিড় ;
বৌয়েরা দোতলা থেকে চুলের বিনুনী হাতে নিয়ে
দেখে পথে বাস্তহারা মায়ের মিছিল।

এখনো অনেক
মেয়েরা কাটায় দিন স্কুল, হিন্দিগান, টেলিফোনে ;
ছেলেরা পাৎলুন পরে, খেলা দেখে, ফেল করে, হাসে ;
কেরানিরা ফন্দি খোঁজে গা-বাঁচানো ফিকিরী স্বর্গের ;
নেতারা ভ্রান্তির জালে বারে বারে জড়ায় জীবন।

এখনো অনেক বাকী। তবু
এখনি এসেছে দিন।

এখনি এখানে
নির্লজ্জ সিঁধেল চোর ডাকু হ'তে গিয়ে ধরা পড়ে ;
নেপথ্যের সাজঘরে একে একে খসে অভিনেতা,
নাটক জমে না বুঝি আর !
আলো-নেভা আসরের পালচাপা বিপন্ন চিৎকার
স্মরণে হৃদ্‌কম্প আনে।

এখনি এখানে
নিরন্ন উলঙ্গ শত কঙ্কাল-মিছিল
যন্ত্রণার সূচীমুখে বিদ্ধ প্রতিদিন
গাঁথে এক অগ্নিমালা।

এখনি এখানে
শিশুরা নিয়েছে জন্ম

শিশুরা উঠেছে বেড়ে কৈশোরের আঙিনার দিকে,
পিতৃলোক হ'তে যার ফাঁসির দড়িতে রুদ্ধ গান
ফেটে পড়ে এদেশের জলমাটি রৌদ্রের ভিতর,
পথের কংক্রিটে ঢালা মায়ের বুকের রক্ত (হায়রে সন্তান !
সে ঋণ হবে কি শোধ !) প্রতি রক্তবিন্দু ঘিরে
বিদ্যুৎকশার অগ্নি হানে।

এখনি এখানে
কত না তরুণমন নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় জ্বলে
আসমুদ্র হিমালয় শহরে পল্লীতে মাঠে কলে
যাদের স্বজন বন্ধু ভাই প্রতিবেশী
উৎপীড়িত হাজতে, বা খুন।
ক্রমেই নিকট হয় সেই সব আগ্নেয় তরুণ,
খোঁজে তারা পরস্পর হাত,
মিশে যায় যন্ত্রণার অনিবার্য টানে।

এখনি এখানে
কেরানিরা মাঝে মাঝে বাহিরে তাকায়, পথ খোঁজে,
শ্রমিকেরা দেয়ালের ভিত ভেঙে মেশে,
কৃষকেরা ধান ছেড়ে ফ্যান চেয়ে মরতে নারাজ ;
বাস্তহারা চেনে বাস্তুঘুঘুর ছলনা।
বঙ্গোপসাগর থেকে তরাইয়ের যতো স্ত্রীপুরুষ
জং-ধরা কপাট খোলে , এখনি এখানে
মানুষের ঘরে ঘরে দুরন্ত অক্ষরে ফেটে পড়ে
শান্তির জীবনতৃষ্ণা , এখনি এখনি
প্রাণের বীরত্বে প্রেম, কবিতার স্বপ্ন, মুক্ত আশা
দেখেছে জন্মের মাটি, যন্ত্রণার ওপারে যেখানে
শাঁখ বাজে, আলো জ্বলে, মায়েরা সন্তান বুকে টানে॥

যখন প্রচণ্ড রোদে

যখন প্রচণ্ড রোদে দুই চোখে ঝাঁঝাঁ অন্ধতার
নামে পীত যবনিকা, মধ্যাহ্নের ব্যস্ততার জ্বালা
চৈত্রের আঁধির মতো হানে তপ্ত বালির প্রহার
মনের দিগন্তে, কিম্বা যখন হতাশা ঢালে গালা
স্বপ্নের চিঠিতে (বন্ধ লেফাফায় থাকে অপঠিত
সোনার লিখন, যার অবরুদ্ধ প্রতিটি অক্ষর
দুরন্ত মুক্তির বীজ নিয়ে তবু প্রত্যহই মৃত !)
অথবা যখন ভাঙে ইস্পাতে গন্ধকে ঠাসা গড়
প্রত্যহের আক্রমণে

তখন দিনান্তে ধুলো মেখে
একবার আস যদি নদীর কিনারে, একবার
সন্ধ্যার সূর্যের লাল আংটির পাথরে যাও দেখে
নিজের আগ্নেয় মূর্তি— উন্মথিত রঙের জোয়ার
ঢেউয়ের সিঁড়িতে নেচে রক্তে যদি ফিরে আসে, যুবা,
তবে মুক্তি ! হৃদ্‌স্পন্দে বাজে তবে উষার দিল্‌রুবা ॥

নির্বাসিতের গান

আবার দুচোখে এস পরিপূর্ণ স্মৃতির ভূগোলে
সীমায় সীমায় বাঁধা হে আমার শরীরী প্রতিমা !
ঝড়ে বাঁকা নারিকেলপল্লবে তোমারই খোঁপা খোলে,
পদ্মার দুরন্ত বাঁকে প্রাণোদ্ধত গ্রীবার মহিমা।

তোমার ও-মুখ আজ দ্বিতীয়ার চাঁদের পাণ্ডুর
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত— যেন রংমোছা কবেকার

পূর্বপুরুষের ছবি— বিষণ্ণ, বিস্মৃত, কতদূর!
পূর্ণিমার ঢেউ ভেঙে এস স্বচ্ছ দু চোখে আবার।
তুমি কি জানো না মেয়ে যৌবনের উদ্দাম নিঃশ্বাস
কাঁপায় তোমার বুকে তীরলগ্ন নৌকার গলুই!
আঁধারের হীরাকষে রুদ্ধ এক জলজ উচ্ছ্বাস
তোমার শরীর ঘিরে কাঁদে, তুমি বোঝো না কিছুই?

কতো রাতে হাটযেরা দেখেছি মাঠের পথে দূরে
আঁধার গ্রামের কোলে অগ্নিবিন্দু তোমার প্রদীপ
প্রতীক্ষায় স্থির; কতো রাত্রিশেষে সোনার মুকুরে
দেখেছি কপালে আঁকো নবারুণ হিঙ্গুলের টিপ।

তোমার তুলনা নাই, কোমলেকঠোর প্রিয়তমা!
বাংলার মাটির মতো কিছু পলি কিছু বা খোয়াই;
কোথাও শিশুর মতো পুতুলের খেলা কর জমা,
আঘাতে জীবন গড়ে, কোথাও বা তুমি সে নেহাই।

তোমাকে দু'চোখে চাই। এস তুমি, হৃদয়ে কাঙাল
কাটে না স্মৃতির স্বপ্নে। খুলে ফেল ও-অবগুণ্ঠন।
থেমে যাক ক্লান্ত সুর, ছিঁড়ে যাক সানাইয়ের তাল,
দু'হাতে হৃদয় দাও— দাও জলমাটির বন্ধন॥

অতিক্রান্তি

যখন কেবলি মানসকামনা
সরাতো বুকের লঘু পাহাড়,
ষড়জে-নিখাদে এঁকেছি কতো-না
আত্মরতির সুরবিহার।

রাগমালা সেই মনের আকাশে
বর্ষণভীরু বলাকামেঘ,
হালকা সাঁতারে আসে যায় আসে
প্রথম প্রেমের মতো আবেগ।

নবফাল্গুনে কখনো বা তার
সাড়ায় কেঁপেছে নতুন পাতা,
ভুঁইচাঁপা খোলে চকিত দুয়ার,
দীঘি ভরে ঢেউয়ে নীলের খাতা।

শুধু ঐটুকু, তার বেশী নয়
একসুরে সাধা সেই রাগিণী
কখনো গোপনে খুঁজেছে প্রণয়,
কখনো বা সাজে বৈরাগিণী।

সে আকাশে আজ বজ্রের দাহ
এল বিদ্যুৎজ্বালা বৈশাখ,
সে মেঘে তরল অগ্নিপ্রবাহ,
সে গানে রুদ্র মত্তপিনাক।

হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে খান্ খান্,
মনের মিনারে ন'ড়ে ওঠে ভিত,
সুরের ঘূর্ণিপ্রলয়ের বান
আনে পাতালের একি সঙ্গীত!

ভাষার পরিধি ছিঁড়ে উড়ে যায়,
খনিজ বিস্ফোরণের আখরে
জ্ব'লে ওঠে মন ধাতব আভায়,
রক্তে গতির বর্ণালী ঝরে।

এ গান আমার অভিজ্ঞতায়
জীবকোষে অণুস্বপ্নকণায়
ফস্‌ফরাস্‌-এর শত দীপাধার
জ্বালে সমুদ্র ঢেউয়ের ফণায়।

ফেটে পড়ে আজ এই সুর বুঝি!
কাঁপে মনে সূর্যাগ্নির স্তব।
এল কি মুক্তি! রঙে রঙে মুছি
রাত্রি, উষার একি বিপ্লব!

অন্যপথ

কেন স্বপ্ন দেখি

একান্ত স্বভাব, তাই
আজও স্বপ্ন দেখি, আজও গান গাই, আজও
মনের গভীরে ডুবে কত রঙ-রেখায় সাজাই
জীবনের চিত্রপট, আহা,
আজও ছেলেমানুষী খেয়ালে
খুশি হই হাঁসশাদা মেঘের সাঁতার
ভেসে এলে পূর্ণিমার রাতের আকাশে, খুশি হই
দুপুরে অশ্বত্থশাখে ঝিরিঝিরি পাতার কাঁপনে
জ্বলনে হাজার হীরে স্তব্ধতার ঝিলিকে ঝিলিকে,
খুশি হই লিখে
একটি কবিতা সারা বৎসরের ব্যর্থতার পর,
একটি প্রেমের লগ্নে যদি কারো চোখে
ছায়া ফেলে আমার এ মুখ, যদি পাই
মুহূর্তের সার্থকতা, খুশি হই। কেননা জীবনে
মুহূর্তেরই খেলা আজ!

দিন দিন বছর বছর জমে জমে
অনেক অনেক গ্লানি পুঞ্জীভূত দাহ
খোঁজে সেই সূচ্যগ্র সময়
যে মুহূর্ত সুতীব্র, উজ্জ্বল,
স্ফুলিঙ্গের মত জ্বালে শতাব্দীর বারুদের স্তূপ,
দেশ কাল মুক্তি পায় সন্ততির হাতে।
সেই তীক্ষ্ণ, সুদূরসঞ্চারী মুহূর্তের
সার্থকতা যদি পাই, যদি
একটি কবিতা, কিম্বা একটি প্রেমের লগ্নে
হাঁসশাদা মেঘের পূর্ণিমা
খুঁজে পায় আমাদের আঙিনার সীমা;
অশ্বত্থপাতার হীরে
জ্বলে ওঠে আমাদের দিনের তিমিরে—
সেই আশা
এখনো এ মড়কের পাহাড়ে পাহাড়ে
নামায় স্বপ্নের ঝর্না,
অজ্ঞতার কোটরে কোটরে হাড়ে হাড়ে
জ্বালায় গানের সূর্য,
বঞ্চনার অবরুদ্ধ প্রাকারে প্রাকারে
ঝল্‌কায় রঙের অগ্নি।
সেই আশা, মজ্জাগত সেই স্বভাবের
অস্থির আবেগে আজও চলি—
কণ্ঠের রজ্জুকে ছিঁড়ে গাই,
দৃষ্টির পাথর ভেঙে আঁকি,
স্মৃতির পাতালে নেমে দেখি,
ঝর্না— সূর্য— অগ্নি।
আজও তাই
স্বপ্ন দেখি, গান গাই, জীবনের আঙিনা সাজাই॥

(হাওয়া লাগে)

অবশেষে হাওয়া পাই ॥

দক্ষিণ সমুদ্র থেকে এঁকেবেঁকে মেঘে লেগে
গাছের পাতায় ডেকে ডেকে
মুক্তির আকাশে নাড়া দিয়ে
পল্লবের আঙুলে গড়িয়ে
গলি বেয়ে দেয়ালের কোলে
ঘরে ঘরে জানালায় দেখা দেয় হাওয়া ;
অন্ধকার গুমোটের পাঁজা
যেন শত খড়খড়ি খোলে ;
গরমে ভেপ্‌সা দেহে, ফুসফুসে, মাথায়
নিঃশ্বাসের মত আসে, সান্ত্বনার মত,
কামনার মত ঘেরে, মিশে যায় রক্তের দোলায় ;
আমরা অনেক লোক বন্ধ ঘরে, যারা আশাহত
ছিলাম নিশ্চুপ একা বুকচাপা নিরুদ্ধ ভাষায়
হাওয়ায় কী জাদু লেগে বাহিরে তাকাই ॥

হাওয়া পাই, আরো হাওয়া পাই ॥

সমুদ্রশীকরমাখা মেঘের বিদ্যুৎ-ছোঁকা
গলিঘোরা বাঁকাচোরা তীব্র হাওয়া পাই ।
ছুঁয়ে যায় গায়ে গায়ে উন্মত্ত ক্ষুধার
রুদ্র একাকার হাওয়া,
দেশদেশান্তর-ঘোচা দূর অতিদূর থেকে পাওয়া
ফুসফুসের অতি কাছে হৃদ্‌পিণ্ডে রক্তের নাচে,
নদীনালা পাহাড়ের তেপান্তর হাওয়া
ঘরের সীমায়, মনে, ক্ষুধার অগ্নিতে গান-গাওয়া
ক্ষুব্ধ এক ঝড়হাঁকা উদ্বেলিত সুর
কেবলই নিকট হয় ; দূর অতিদূর

কেবলই নিকট হয় ; দেয়ালের উদ্ধত বড়াই
ভেঙে যায় ; গারদের অন্ধ গড়খাই
খুলে যায় ; আসে হাওয়া আসে
শ্বাসরুদ্ধ ঘরে ঘরে, মৃত্যুর বিবরে, স্তরে স্তরে
রুদ্র এক হাওয়া আসে মুক্তির নিঃশ্বাসে ॥

হাওয়া পাই ।

(অন্য পথ)

এবার সূচনা করি—
অন্য কথা, অন্য দিন, অন্য এক পথ ।
ধুলো, কাঁটাঝোপ, মাঠ
পায়ে পায়ে ভেঙে, কবিতার ছত্রে ছত্রে
দিনের শ্রমের শর্তে অন্য পথ গড়ি—
রচনার আনন্দে যে প্রিয়া, দুঃখে জায়া, যাত্রায় যে সহচরী
সেই পথ, সেই অন্তরঙ্গ আর উত্তরঙ্গ পথ
কঠিন মাটির বুকে দিগন্ত-হৃদ্‌পিণ্ডের দিকে
আঁকাবাঁকা সে লাল ধমনী
পদক্ষেপে নাড়িস্পন্দে প্রতিদিন জেগে উঠে
আমার অস্তিত্ব ঘিরে বাজাক মুক্তির নহবৎ ।

এবার তাহলে অন্য পথ ।

পুরনো সড়কে আজ স্বাচ্ছন্দ্যের গুলজার নরক—
আরামে নিমীলনেত্র কেউ, কেউ অহংকারে
সন্ত এক তানছাড়া ওস্তাদের মত
এদিকে ওদিকে চায় বাহবা কুড়ায়,
কেউবা লুঠের মাল বেমালুম চুপিসারে
সরায় ; সবাই হাসে ; কথা কয় ; যদিও বস্তুত
কেউই শোনে না, কিম্বা করে না সে উক্তির পরখ ।
কথায় কথায় নেচে ভেসে যায় পিচ্ছিল সড়ক ।

ফলে এই কাঁটাপথ; আমার নিজের
পায়ে পায়ে হাঁটাপথ; যদিও বাজে না নহবৎ
এ পথের মোড়ে; পদক্ষেপে রাত্রিদিন
শুধু ধুলো ওড়ে; তবু আমি যাব
রক্তরাঙা এই পথে দিগন্তের দিকে।
কেননা জীবন চাই, চাই গ্রামরেখা
যেখানে বসতি আছে, আছে শিশু, আঙিনা ও গাছ,
গাছের মাথায় নামে যেখানে সূর্যের লাল
জীয়নকাঠির রশ্মিজাল
জাগে পাখি, মানুষের ঘর জাগে, আমি
সেই পথ আঁকি, এতদিন পরে, আহা, এতকাল পরে—
এতকাল!

কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে এতকাল
চলেছে কথার দাবা ছক থেকে ছকে,
আজ বাজিমাৎ—থেমে গেছে হাত। বকে
এখনো অনেক লোক; বকে আজেবাজে বেহুঁশ বেচাল;
এবার কথায় কিছু প্রেম দাও, আবেগ জমাও;
বুকে বুক রেখে,
কাঁটাগুল্মে আগাছায় প্রাণের ঔরসে পথ এঁকে
হে আমার কবিতা, হে রুদ্র
সন্ন্যাসী! ঘরের পথে শুষ্ক মাঠে বালির সমুদ্র
পার হও। দিগন্তের দিকে
গ্রামের হৃদ্‌পিণ্ড ছুঁয়ে মুক্তির নিরিখে
দাও সেই যুগ-যুগ মৃত্যুছোঁকা আশ্চর্য সম্পদ—
অন্য কথা, অন্য দিন, অন্য এক পথ॥

অন্য মাটি

এখানে সে নদী নেই। আকাশরেখায় ছোঁওয়া জল
যেখানে দুকূলভাঙা প্রণয়ের রহস্যে অপার
যুবতীর মতো খোলে ভরাবুকে পালের আঁচল,
অথবা যেখানে পাতে গ্রামে তার মেয়েলি সংসার
ঘাটে ঘাটে সে প্রবীণা—বধূদের ঘরোয়া আলাপে
মিশায় স্রোতের ভাষা, গৃহস্থের দিনান্তের ধূলি
মুছে দেয় অঞ্জলিতে, শিশুর উল্লাসে হাসি চাপে
দুরন্ত সাঁতারে বুকে টেনে বাঁধে ঢেউয়ের অঙ্গুলি

এখানে সে নদী নেই। এখানে মাটিও নেই; ঘরে
নিকানো দাওয়ার মতো মায়ের শয্যার মতো চেনা
গন্ধের নিঃশ্বাসে ঘেরা উষ্ণতার যে মাটি আশ্রয়,
এখানে সে ঘর নেই। তবু দেখ শিশু খেলা করে
শিয়ালদার প্লাটফর্মে। স্বপ্ন তার দু'চোখে ঘোচে না
পাথুরে ফাটলে একি অন্য মাটি খোঁজে কিশলয়!

সাপুড়ে

চৈত্রের দুপুরে তুমি খামারের গর্তে, ইটখোলার
ঝোপে-ঝাড়ে, মাঠে মাঠে, ভাঙা দালানের পাশে ঘুরে
বাজাও তোমার বাঁশি একটানা তীক্ষ্ণ সাপতোলার
সুরে সুরে। ডাকো গোখরো কালনাগ বোড়া শঙ্খচূড়ে
গর্তের বাহিরে রৌদ্রে মেলে দিতে ফণার উল্লাস।
তারপর অকস্মাৎ থামে বাঁশি। ধরো মুঠি চেপে,
বিষদাঁত ভেঙে রাখো ঝাঁপির কয়েদে। বারোমাস
নারী আর শিশু হাসে, যতো সে ছোবল হানে ক্ষেপে!

আমাদেরও মাঠে দগ্ধ চৈত্রের দুপুর। ঘরে ঘরে
বিষের নিঃশ্বাস, মনে দুর্ভিক্ষের জ্বালা, হিংস্র দিন
রাত্রির বিবর থেকে ছুটে এসে ক্রুদ্ধ ফণা ধরে।
ভাঙো তার বিষদাঁত, হে সাপুড়ে, কর অন্তরীণ
ঝাঁপির পাতালে, যেন এ-সাপেরও মণি লুটে হাসে
প্রত্যহের শিশুসূর্য আমাদের আঙিনার পাশে॥

ভোরের স্বপ্ন

দেখ তমস্বিনী মেলেছে চোখ
হেমকান্তি ঐ মেঘসমাজে!
আজ সূর্যোদয় মধুর হোক,
জাগে স্বপ্ন যেন দিনের কাজে।

এস রাত্রিশেষে ঘোমটা খুলে,
কর্মঘন আশা দু'চোখে জ্বালো,
শ্রমবিন্দু-ঘেরা কপালে চুলে
মুখশ্রী তোমার মানাবে ভালো!

যদি দীর্ঘ পথে কাতর হই
ক্লান্তি নামে এই অন্বেষণে,
পাব যৌবনের মরণজয়ী
স্বপ্ন, আহা, ঐ হৃদয়মনে।

তুমি বৃন্ত যেন, পাপড়ি আমি।
দীপ্ত শিখা তুমি, আমি আধার।
দুটি পক্ষ একই আকাশগামী,
দুটি পংক্তি মিলে একই পয়ার!

মুক্তি-খোঁজা দিনে প্রেয়সী তাই
ডাকি কণ্টকিত প্রেমের পথে।
তুমি সঙ্গী হলে কাকে ডরাই,
স্বর্গ জেগে ওঠে এই ধুলোতে!

সূর্যকেই বুঝি সে প্রেমিক

সূর্যকেই বুঝি সে প্রেমিক চেয়েছিল তার ঘরে
জেলে দিতে উৎসবের ঝাড়। আসন্ন সন্ধ্যার রাঙা
আবেগের উত্তেজনা এঁকে দিল দীর্ঘ রেখা ঢেউয়ের উপরে
নদীর হৃদয়ে। কেঁপে উঠল জল, অন্ধকার, ডাঙা,
গাছের মর্মর, পাখি। ফুলের পাপড়িতে কেঁপে
উঠল প্রজাপতি। ঘাটে জল নিতে এসে বধূ শোনে
কী এক অস্পষ্ট ভাষা কেবলই ঘড়ার মুখ ছেপে
বুকে বাজে; প্রতীক্ষার চাউনি ফোটে দুচোখের কোণে!

ওদিকে আকাশ তীব্র। পশ্চিমের অগ্নিবর্ণ ঝাড়
জ্বলে উঠল থরে থরে। রাত্রির গম্বুজে-থামে আলো
ঝলমল ঝিকিয়ে উঠল। প্রেমিক দু'হাতে একবার
তুলে ধরে সে আগুন— মনে হয় রাত্রি তো মিলালো।
তারপর ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ভাঙে ঝাড়, খান্‌-খান্‌ অগ্নির
টুকরোয় নক্ষত্র জ্বলে, যন্ত্রণায় পৃথিবী অস্থির॥

উৎসব

ইলেকট্রিক আলো নেই। মঞ্চসজ্জা লাউডস্পীকার
কিছু নেই। প্রধান অতিথি কিম্বা সভাপতি কেউ
এমন বিখ্যাত নয় যার সারগর্ভ বক্তৃতার
বিবরণী টুকে নিতে সঙ্গে আসে কাগজের ফেউ।

গান, তাও গাইবে যারা রেকর্ড কিম্বা রেডিওতে
বাহবা পায়নি। আর শ্রোতাদেরও তেমনি নমুনা—
আটপৌরে পোষাকে ব'সে লণ্ঠনের বেঘোর আলোতে
নিতান্ত এ-ও-সে, যারা বিদগ্ধের জাগাবে করুণা!

উদ্বাস্তু ক্যাম্পের এই রবীন্দ্রউৎসব। ইচ্ছে হ'লে
মনে করতে পারো সবই ছেলেখেলা। কিন্তু ভাবো যদি
এদের সাজানো স্বপ্ন জ্বলে গেছে বিষের ছোবলে,
এবং ক্ষুধা ও মৃত্যু শতপাকে বেঁধেছে সম্প্রতি,
তখনই হয়তো বুঝবে, কী বলছে এ নগণ্য উৎসব ঃ
বজ্রের অঙ্গার ঢেকে অশ্বত্থ মেলেছে কী বৈভব॥

খোয়াই

আমাকে ধিক্কার দাও, অবহেলা, অথবা যা খুশি।
বলতে চাও বল ব্যর্থ, অপদার্থ। কিন্তু মনে রেখো,
এ আমার সাধ নয়। আমিও যে খুঁজেছি পৌরুষই
তোমার ডায়েরীতে কিম্বা চরিত্রচিত্রণে সেটা এঁকো
সহানুভূতিতে। বন্ধু, এ নাটকে আমি কর্ণধার
নই তা নিশ্চিত। কিন্তু কুঞ্চকীও নই, যে হারেম
আগলায়, কুর্নিশ করে, পায় শেষে শতেক পয়জার।
না। আমি নায়ক, বন্ধু! যদিও বীরত্ব কিম্বা প্রেম
বর্ষার নদীর মতো দু-পাড় ছাপিয়ে আদিগন্ত
করেনি সরস, ক্ষেতে ফলেনি আমন, ঘরে ঘরে
জাগেনি উৎসব, তবু জীবনের ক্ষুধা কী প্রচণ্ড
জ্বলে এই বুকে দেখ! কাঁটাঝোপে বালুতে কাঁকরে
আমি যেন বীরভূমের ভাঙাচোরা রক্তাক্ত খোয়াই,
কোদালে-লাঙলে-সেচে চলে তবু শস্যের লড়াই॥

পূর্বরাগ

সূর্য নেমে গিয়েছে তবু এখনও রঙ ধরেনি,
সোনালি আভা লাগেনি এই কলকাতার কপোলে ;
ঘরনী মহানগরী তার মোহিনী শাড়ি পরেনি,
এখনো গৃহকাজের ছাপ হলুদলাগা আঁচলে ।
সে যেন এক জানালা-ধরে-দাঁড়ানো কালো মেয়ে
ক্লান্ত চোখে পথের দিকে রয়েছে একা চেয়ে ।

ঘরের লোক ফেরেনি ঘরে, গিয়েছে রুজি শিকারে ।
কারো-বা হাতে গাঁইতি, কারো কলম, দাঁড়িপাল্লা,
মায়াহরিণ ছোটায় কত অপঘাতের কিনারে,
পায়ের নীচে ফেরার পথ ক্রমেই যেন আলগা ।
আতঙ্কের উৎস হ'তে ঝিকিয়ে-ওঠা ক্রোধ
মনে তাদের হাজার ঢেউয়ে জালে হীরক রোদ ।

সেই আগুন ছড়ায় আজ কারখানার হাপরে,
হল্‌কা লেগে পথে বেরোয় বাবুপাড়ার সঙ্গী,
জলছে আর চলছে যত স্বস্তিহীন হা-ঘরে—
এ ওর চোখে সাহস পেয়ে ক্রমেই তারা জঙ্গী ।
বীরের প্রেম নয় কি মেয়ে কাম্য উপহার ?
এখনো তবে মৌন কেন কীসের দেরি আর !

কখন হবে সময় বল, সাজবে তুমি নগরী ?
তোমার চোখে উঠবে জলে প্রেমের জয়বার্তা ?
হাওড়া ব্রীজে বুকের দুই চূড়ায় আলো ঠিকরি'
কবে তোমার শিরায় বল মশাল-শোভাযাত্রা ?
আপনজনা ফিরবে ঘরে, সেই আশাতে বধূ
দু-চোখে তুমি ছড়াবে কবে আগুনরঙা মধু !

সেদিন কবে— কবে সেদিন, বৈশাখীর ডঙ্কা
তোমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বরের ভাষাতে!
হাওয়ার বাঁশী নাচায় ফণাউত্তল ঐ গঙ্গা,
বাঘের মতো গর্জে মেঘ বিদ্যুতের কশাতে!
সেদিন তুমি উন্মাদিনী, কৃষ্ণচূড়া ছিঁড়ে
চন্দনের ফোঁটার মতো সাজো কপাল ঘিরে!

স্বপ্নে জাগে তোমার সেই মূর্তি আজ হৃদয়ে,
সয় না আর স্তব্ধ মনে প্রতীক্ষার আর্তি।
বজ্র যদি হানতে চাও থমকে আছ কী ভয়ে?
দগ্ধ বুকে মশাল জ্বেলে আসবে তবু প্রার্থী!
তাদের পথে বিদ্যুতের আলপনায় আঁকো
তোমার প্রেম, তোমার বুকে ডাকো তাদের ডাকো॥

শুধু এইটুকু

এ ঘরে দিনের আঙিনায় পোড়া বালু
পায়ে পায়ে যন্ত্রণা,
রাত্রির চোখে ধিকি ধিকি অঙ্গার
এ ঘরে কী সান্ত্বনা?
সকাল-সন্ধ্যা অশ্রুর উপহার!

প্রিয়তমা, এই দুঃখের কাঁটাঝোপে
রজনীগন্ধা নেই,
তবু তুমি ঘোরো ভাঙা বাগানের মাঠে
ফুলের সন্ধানেই?
আশাহীন, তবু কী আশায় দিন কাটে!

সামনে তোমার দুর্ভিক্ষের ছায়া
বাড়ায় অন্নথালি,
প্রতি দিবসের স্বপ্নের অপঘাতে
প্রতিদিনই জোড়াতালি ;
তবু শাঁখ বাজে আলো জ্বলে আঙিনাতে ?

কী কঠিন এই সাধনা তোমার মেয়ে !
শত শতাব্দী জুড়ে
যতোবার ভাঙে রাজধানী-প্রস্তর
লুটেরা অশ্বখুরে,
পোড়া গ্রামে যেন তুমিই তুলেছ ঘর।

জল তোলো তুমি আবার ইঁদারা থেকে
কাঠ খোঁজো জঙ্গলে,
কালবৈশাখী ছুঁড়ে দিলে বিভীষিকা
ঢেকে নাও অঞ্চলে
তোমার ঘরের কাঁপা প্রদীপের শিখা !

তোমাকে কী দেব ? তুমি যেন মৃত্তিকা
চির নবযৌবনা,
লাঙলের বিঁধ ঢেকে মাঠে মাঠে ঢালো
বাৎসল্যের সোনা !
শোণিতে তোমার সৃষ্টির রাঙা আলো।

বলি তাই, তুমি আমাকে রচনা কর !
গন্‌গনে ঐ আঁচে
পোড়াও, পেটাও অগ্নিহাতুড়ি ঠুকে
ঢালো জীবনের ছাঁচে।
রাতের স্বপ্ন ফোটাও দিনের বুকে ॥

অসম্পূর্ণ

আশ্বিনে আজ অতীত হল কি তুচ্ছ ?
সোনালি দিনের খুশির আভায়
দীপ্ত সবুজে গিনি ঝরে যায়,
মাটির কামনা মিটেছে ধানের গুচ্ছে !
তবু কি তৃপ্ত হয়েছে যা-কিছু ইচ্ছা ?

মনে আছে সেই গ্রীষ্মের দিনপঞ্জি !
রোদে ফুটিফাটা মাঠের পাঁজরে
কচি শস্যের চারা ধুঁকে মরে—
ঘূর্ণি-ধুলোয় এসেছে নকল পাঙ্গা,
আসেনি প্রবল বর্ষণে মেঘপুঞ্জ ।

এল তারপরে ঢলনামা ক্ষ্যাপা বন্যা ।
ক্ষুব্ধ নদীর ঢেউয়ের ঝাপটে
মনে ভয় জাগে কখন কী ঘটে !
সর্বনাশের বাঁধভাঙা পৈশুন্যে
বুঝি ডোবে মাঠে সারা বছরের অন্ন !

সে ফাঁড়া কেটেছে, ফিরে গেছে সেই দস্যু
চৈত্র শ্রাবণ পার হ'য়ে আজ
শরতের মাঠে পেয়েছি স্বরাজ,
প্রাণপ্রাচুর্যে দেখি নই বটে নিঃস্ব
তবু কী চিন্তা ছায়া ফেলে সেই দৃশ্যে !

মনে হয় তবু আজো মেটেনিকো স্বপ্ন ।
ফসলের আশা যতই ভোলায়
দেখি আজো তাকে তুলিনি গোলায়,
ভরা আশ্বিনে জ্বলি তাই খর প্রশ্নে—
কবে যে পৌষলক্ষ্মী মিটাবে তৃষ্ণা !

হাজার মানুষের শহরে

হাজার মানুষের শহরে
একলা বসে আছি এ ঘরে,
বাইরে বৃষ্টির অঝোর সন্ধ্যা,
আমারই মনে থর বহ্নি
শুকায় স্বপ্নের ফোয়ারা।

পড়েছি শ্রাবণের লিপিকা
(বলতে বাধে কীসে জীবিকা,
মাইনে দু অঙ্কেই বাঁধা অবশ্য
কাজেই অসূর্যম্পশ্যা !)
শ্রাবণ ডাকে দূরে যাবে কে ?

ইচ্ছে হয় বটে সাড়া দিই !
এখনো সব সাধ তামাদি
হয়নি, এখনো যে মরছে গুমরে
অন্ধকারে মন-ভোমরা
যৌবনের আশা জাগাতে।

এখনো মাঝে মাঝে এ খেলা
নিজেরই সাথে খেলি একেলা—
আমার সবই আছে, বধূ ও বন্ধু,
শূন্য নয় এই সন্ধ্যা,
এ শুধু ক্ষণিকের হেঁয়ালি।

বলতে ভুলে গেছি গোড়াতে
অধুনা রয়েছি যে ডেরাতে
সে নয় অধমের স্বকীয় বাস্তু
(যদিও নয় ঠিক বস্তি)
মাসিক মূল্যের অতিথি !

ঝামেলা ? অবশ্যই নেই তা।
এ যেন পালতোলা নৌকা।
(উপমা যাই হোক) এ স্বাচ্ছন্দ্য
বাইরে, ভিতরে যে বন্দী
সে জ্বালা চিরদিন সয় কে !

তাই তো বৃষ্টির শ্রাবণে
চাকায়-বাঁধা দিনযাপনে
হঠাৎ ছেদ নামে, ক্ষতের উৎসে
তীব্র জ্বালা ভাঙে মূর্চ্ছা,
আবেগে দ্রুত চলে ধমনী।

দেখি এ অজস্রের শহরে
বন্দী আমি এই কবরে,
দিকে দিগন্তরে প্রাণের বন্যা,
আমারি মনে শুধু বহ্নি
বাজায় শূন্যের ডমরু।

হঠাৎ কোন ফাঁকে জানি না
পেরিয়ে নিষেধের আঙিনা।
এসেছে টলে টলে শিশু উলঙ্গ
(এ ঘরে সে প্রথম সঙ্গী !)
দু-হাতে ধরে হাত না-চিনে।

সে যে কী ছোঁয়া আমি কী ক'রে
বোঝাব, যেন মরা শিকড়ে
নামল বছরের প্রথম বর্ষা,
শুকনো ডালে সে কি হর্ষে
জাগায় অরণ্যইশারা।

একটি শিশু যেন একাকী
ভাঙল শূন্যের এ ফাঁকি।
মানুষ···মনে জাগে এ উপলব্ধি
মানুষ···মনে পদশব্দ!
দু-হাতে বুকে তুলি শিশুকে॥

বাবলার গান

কচি কচি মেঘ আকাশের আঙিনায়
কত খেলা কত স্বপ্নের জাল বোনে।
কখনো তাদের চোখ ভেজে কান্নায়,
হাসির ঝিলিক কখনো ঠোঁটের কোণে!

আমাদের ঘর শুধুই ধমকে ঠাসা।
হাসি নয়, আহা, কান্নাও চেপে ধরে।
ওরা কি বুঝবে আমাদের কত আশা
ইটের চাতালে শিউলির মতো ঝরে

ও মেঘ, তোমার আকাশের সিঁড়ি কই?
নীল ছাদে উঠে নেব বুক ভ'রে হাওয়া,
শুনব-যে সাতসাগরের হৈ হৈ,
সাতরঙা রামধনুকের গান গাওয়া!

চিঠি

সুশান্ত, তোমার মনে পড়ে
সরলার মাকে, যে এখানে
কাজ করত? হঠাৎ সেদিন
শুনল যেই বন্যা পাকিস্তানে,
বুড়ি গিয়ে বসল বারান্দায়,
দেখি তার চোখে জল ঝরে।

জানতাম অবশ্য পাবনায়
বাড়ি তার, উদ্বাস্তু রমণী।
কিন্তু নেই তিন কুলে কেউ,
সরলাও গেছে পরলোকে,
তার মনে জাগল কার শোকে
দ্বিতীয় বন্যার এই ঢেউ?

তোমাকে, সুশান্ত, সত্যি বলি
এ ঘটনা কিছু গুরুতর
তা ভাবিনি, তবু কৌতূহলী
প্রশ্ন করি— কাঁদো কেন? বানে
পাবনাতেই শুধু বাড়িঘর
ডোবেনি তো! তাছাড়া ওখানে

কী আছে তোমার, কেন কাঁদো?
শুনে বুড়ি চোখ মুছে বলে—
কান্নায় তখনো বাধোবাধো
গলা তার— বলল, কাঁদি কেন
তা তোমারে বোঝাই কী করে?
ভগবান আমারে দিল যে

কাঁদনের কপাল কী কব !
সোয়ামী মরেছে কোন কালে,
এক মেয়ে সেও গেল শেষে ।
ভিটামাটি ছেড়ে একা আমি
বেঁচে আছি এ পোড়াকপালে
তোমাদের দুয়ারে বিদেশে !

আমি হেসে সান্ত্বনার স্বরে
বলি, মিছে বিদেশ কেন যে
ভাবো তুমি, এই তো তোমার
আপনার দেশ । এখানেও
বন্যা কত দেশ গ্রাম মোছে,
কতো ঘরে মৃত্যু হাহাকার ।

বুড়ি বলে, আহা বাছা তারা
বেঁচে থাক । আমি অতশত
বুঝি না তো । কিন্তু সেই বাড়ি
এতোটুকু হ'তে যারে চিনি
আর সেই ঘর পুবদুয়ারী
সিঁদুরে আমের সেই চারা

সবই আজ পরের অধীনে,
তবু সবই ছিল— পর কেন
তারাও তো আপন আমার—
নগদ দামেই নিল কিনে
রহিমের বাবা, এতোদিনে
বানে ডুবল সে ঘরদুয়ার ।

বলি আমি— গেছে যেতে দাও,
জলজ্যান্ত আমরা তো আছি,

আমাদেরই দেখে শান্তি পাও।
বুড়ি বলে— ও সোনা, ও সোনা,
বেঁচে থাকো এ মাথায় চুল
যতো আছে! তবু তো রসুল

করিমের বেটা তারো কথা
কিছুতেই ভুলতে পারি না যে!
এ দুর্দিনে সে কি বেঁচে আছে,
আছে মাঝিপাড়ার আমিনা,
আর সেই বুড়া বটগাছ
তারো কথা ভুলতে যে পারি না।

সরলার মা তো নিরক্ষরা।
মনে তার দুর্জ্ঞেয় জগৎ।
যে বিশ্বাসে পাখি বাসা গড়ে,
গাছে ফুল ফোটে, ধরে ফল,
মা তার শিশুকে বুকে তোলে
যুক্তি তর্ক সেখানে অচল।

কাজেই নীরবে উঠে আসি।
দেখি, বুড়ি ঘোলা চোখে চেয়ে
ভাবে তার হারানো জীবন,
কতো স্বপ্ন ছবির মতন
ভেসে ওঠে সে দৃষ্টিতে, আর
তোলপাড় করে তার মন!

বুঝি সে তো খোঁজে না স্বদেশ
টাকা আনা পাইয়ের হিসাবে,
ঘর-বাড়ি-মানুষ-প্রকৃতি
বিন্দু বিন্দু মিলে যে উন্মেষ

সে দীপ্ত আলোতে তার স্মৃতি
আশ্বিনের প্রখর আকাশ !

সুশান্ত, দেশকে ভালোবাসো
এ তোমার গর্ব— আমারো তা !
কিন্তু এই শিরায় শিরায়
ওতঃপ্রোত আশ্চর্য চেতনা
আছে কি ? বল তো কার মনে
সোনা হ'য়ে জ্বলে ধূলিকণা !

নক্সীকাঁথার কাহিনী

সামনে তার হারিকেন চিমনিভাঙা কালিতে আচ্ছন্ন,
শীতের সন্ধ্যায় ফের সরঞ্জাম নিয়ে বসল মেয়ে।
ছেঁড়া কাপড়ের ফালি, বাতিল শেমিজ টুকিটাকি—
আর দেরি নয়,
পৌষে না হোক মাঘে সে আসবেই, সময় আসন্ন ;
দ্রুত চলে হাত, চলে লালনীল সুতো, নক্সা ওঠে ;
মুখে তার আলো পড়ে, চারিদিক ছায়া-ছায়া, আর
মন স্বপ্নময়।

উঠোনে নিমের চারা, ঈষৎ হাওয়ায় পাতা কাঁপে,
পোষা কুকুরের ছানা কুণ্ডলী পাকিয়ে বারান্দায়,
এ-বাড়ি ও-বাড়ি থেকে এলোমেলো কথা ভেসে আসে,
চাপা অন্ধকার !
এ সময়ে মন যেন বুকের খাঁচায় মাথা কোটে,
ঝাপটিয়ে দুখানি ডানা খোঁজে মুক্ত স্মৃতির আকাশ—
হায়রে কোথায় সেই হারানো সংসার, কতো দূরে
নীল পদ্মাপার।

তবু শোক নয়, দুঃখ অশ্রু মোছে আপন উত্তাপে।
(যেখানে আদর নেই, অভিমান কে করে নির্বোধ !)
লাজুক গাঁয়ের মেয়ে, নির্ঝরের গুহা ভেঙে সেও
নেমেছে প্রান্তরে।
স্বামীকে পাঠায় রোজ ফুটপাতের দোকান আগলাতে,
তিন বাড়ি কাজ সেরে গা-গতরে ক্লান্তি ব'য়ে নিজে
দিনান্তে স্বপ্নকে তার বাঁধে রাঙা সুতোর নক্সায়
কাঁথার উপরে।

কে দেখেছে জীবনের অপচয় বেশি তার চেয়ে ?
কে সয়েছে এত গ্লানি রানাঘাটে, ক্যাম্পে ক্যাম্পে, পথে,
উড়িষ্যার তেপান্তরে, জনহীন দ্বীপান্তরে আর
হাওড়ার স্টেশানে ?
অচল পয়সার মতো পরিত্যক্ত, তবু বার বার
কে এমন ফিরে আসে, ঘর বাঁধে, কার এত আশা ?
দারিদ্র্যের কাঁটাগাছে দুরন্ত স্বপ্নের রাঙাফুল
ফোটাতে কে জানে !

সন্ধ্যায় লণ্ঠন জেলে বসে তাই বারান্দায় মেয়ে।
নিভে গেছে দিন তার, ক্ষয়ে যায় রাত্রির বিশ্রাম,
সেলায়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে যন্ত্রণা ও স্বপ্ন তবু যেন
স্বর্গে তোলে মাথা !
পৌষে না হোক মাঘে যে আসবে সে নবজাতকের
ধূলিশয্যা ঢেকে দিতে পৃথিবীর মতো ধৈর্যময়ী
সুতীব্র ইচ্ছার বিঁধে আদিগন্ত শস্যের মাটিতে
রচে নক্সীকাঁথা ॥

ভাষার শহীদ

সবই তো নিয়েছ ! দেখ, কয়েকটি পয়সা বা কিছু চাল
এই খুঁজে সকাল দুপুর সন্ধ্যা প্রায় জানোয়ার
পথে পথে ফিরি, আর রাত্রিশেষে নতুন সকাল
খাপখোলা ছুরির মতো ছুটে এলে রাস্তায় আবার
সেদিনের মুক্তি খুঁজি । সবই তো নিয়েছ ! শুধু আছে
বুকের অত্যন্ত নিচে কী জমাট অশ্রুর যন্ত্রণা…
সীসের ছর্‌রার মতো বিন্দু বিন্দু হৃৎপিণ্ডের মাঝে
বেঁধে সে প্রতিটি দিন।

কিন্তু তবু ছিল তো সান্ত্বনা
ছেঁড়া মাদুরের কোণে শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে
আদরের ভাষা বলে, কিম্বা অন্ধকারের বনাতে
স্ত্রী আর স্বামীর প্রেমে টানাপোড়েনের সুতো দিয়ে
ফোটানো বিচিত্র ফুল, অথবা বন্ধুর আর্তনাদে
সাড়া দেওয়া, এইটুকু ! তাও নেবে ? নাও বুক চিরে।
(জননী বাংলা ভাষা, এত রক্ত ছিল এ শরীরে !)

বর্ষার স্বপ্ন

বর্ষা কি কবির স্বপ্ন ! দেখ তার হিংস্র মত্ততায়
আকাশে মাদল বাজে যেন কোন আদিম বন্যের
ডিমি ডিমি রণসাজে, বাতাসের চীৎকারের ঘায়
দিগন্তের বাঁধ ভাঙে, ছুটে আসে মেঘের সৈন্যের
পেশল পাথুরে দেহ, ঝাঁকে ঝাঁকে নামে তীক্ষ্ণ তীর,
মহীরুহ মাথা কোটে, সূর্যালোক ভয়ে চোখ বোজে—
যেন ক্ষিপ্ত হূন কিম্বা বর্বর তৈমুর কি নাদির
ত্রস্ত নগরীর পথে সোনা আর ক্রীতদাস খোঁজে।

এ দিনে জীবন স্তব্ধ। কাকেরা কার্নিশে, ঝিল্লিগুলা
বস্তির ছাউনিতে, ভিক্ষুকেরা গাড়িবারান্দার নিচে
যে যার সংগ্রাম ছেড়ে, পরাজিত, খুঁজেছে আস্তানা।
কেবল থামে না দূর গ্রামের দুর্ভিক্ষে শাক-তোলা,
থামে না নীরক্ত বুকে দুহাতে শিশুর স্তন্য টানা,
আর আশা : কবে দস্যু দ্বিখণ্ডিত রৌদ্রের কিরিচে।

সানাইওয়ালা

কেন তুমি সুরে সুরে তোল এই মরীয়া জেহাদ
সানাইওয়ালা ? বন্ধু, তোমার এ শিল্পিত যাত্রা
ভাবো কি একটিও মনে আনে কিছু অন্য বার্তা
স্বপ্নের, প্রেমের ? বাড়ে জীবনের সতৃষ্ণ মেয়াদ ?
এরা নয় সে দরদী। এই তীব্র সুরস্রাবী রাত
মরচেধরা মনে মাথা কোটে, তবু এরা কোনো পাত্তা
পায় না সে আহ্বানের। পানাহারে তৃপ্ত, ঠাট্টা
হাসি-মস্করায় তোমার সুরের বুকে চালায় করাত
এরা উদাসীন। শুধু কন্যাকর্তা শোনায় গৌরবে
ক'মুদ্রা তোমার মূল্য। তারপর মোটরের সারে
নানাবিধ টয়লেটের গন্ধে আর মুরুব্বির স্তবে
সন্ধ্যা কাটে। আব তুমি শালুঢাকা বাঁশের খোঁয়াড়ে
দ্রষ্টব্য ! (কেউ কি শোনে ? দেখে শুধু !) বল, বন্ধু, কবে
মানুষের এ জঙ্গলে সাড়া মিলবে নগ্ন হাহাকারে !

আমরা ক'জনে

কে বলে এ সবই ভ্রান্তি ? যতো স্বপ্ন আমরা ক'জনে
গড়ি সে নকল স্বর্গ— আচম্বিতে ভেঙে যাবে সবই ?

৫ (৬১)

তিল তিল এ বঞ্চনা মূল্য তার সোনার ওজনে
পাবে না, কালের স্তম্ভে আমাদেরো সামান্ত পদবী
উৎকীর্ণ হবে না ? বন্ধু, পৃথিবীর দূরতম কালে
যে অরণ্য ছিল তারো অঙ্গারিত উদ্ভিদ হৃদয়
যদি আজো সৌবকণা ধরে রাখে খনির পাতালে,
তবে প্রতি জীবনের নবজন্মে কান্নার সময়
আমরাও রয়েছি বেঁচে।

আমরা যে কবি, বন্ধু, তাই
জীবনের যতো দাহ সবই তার তীক্ষ্ণ পরকলা
পায় এ হৃদয়ে, জ্বলি যন্ত্রণার ঝিলিকে ঝিলিকে।
তবু কী বিচিত্র দেখ দুঃসাহসী প্রাণের রোশনাই—
যখন ফোটে না ফুল, কোকিলেরও স্তব্ধ কথা বলা,
আমরা দিনের চোখে চোখ রেখে তবু চলি লিখে !

আবির্ভাব

কে জানত এই আনন্দ এতো তীক্ষ্ণ।
বর্শাফলার মতো মুক্তির মহিমা
ছিঁড়ে দিয়ে যাবে অনভ্যাসের জড়িমা,
এ মনে আবার যৌবন উদ্ভিন্ন।

চেয়েছি তো এই মুক্তি। তবুও তর্ক
যুক্তির শরবর্ষণে নামে জীবনে,
সে চক্রব্যূহে যেই ফিরে আসি পিছনে
এল উদ্যত শমীবৃক্ষের খড়্গ।

মৃত্যু অনেক, বাধা কম নয়, ভ্রান্তি
পায়ে পায়ে ঘোরে, অত্যাচারের ঠিকুজি-

দীর্ঘ, তবুও যদি ভুলে যাই কী খুঁজি
মিছে তবে প্রতিদিনের ছিলাতে টান দিই।

তাই দেখি আজ ধমনীর ঐশ্বর্য
ছড়িয়ে যখন আমারই দেশের যুবারা
জ্বেলেছে রাত্রিপাহাড়ে অগ্নিফোয়ারা
আনন্দে আব বাঁধে না আমাব ধৈর্য।

এ যে কী মুক্তি, এই যেন নবজন্ম!
যৌবন-জলতবঙ্গে জাগে বেদনা,
ঘনমন্থনে ছিন্ন কবে সে চেতনা,
অমৃতকলস হাতে নিয়ে ওঠে স্বপ্ন।

আনন্দ, এবং আনন্দ

না, আমি হাওয়ার হাতে টিনেব মোরগ যে আনন্দে
ঘুবে ঘুরে নাচে মানমন্দিরের চূড়ায়, কখনো
চাইনি তা। গলুই-লাফানো এই স্রোতে আদি-অন্তে
ভাঙে সংঘর্ষেব ঢেউ, ক্লান্তি, নামে অশ্রুর লবণও।
তবু কুমোরেব মতো শিল্পস্নাত চেতনা আমাব
কাঠামোয় খড় বাঁধে, তাল তাল বোবা মাটি ছেনে
মূর্তি গড়ে। কেননা জীবন এক ধৈর্যময় গবেষণাগার—
বিশাল কয়লার খাদে হীরা বেখে যে বলে : বেছে নে!

যা কিছু হয়েছে, হবে, সে কি জল-পড়ে-পাতা-নড়ে
এতো সোজা! বীজের খোলস ভাঙতে চারা কেন তবে
বাঁকায় পিঠের ধনু? নদী ছুটে যায় না সাগরে
টর্চের আলোর মতো ঋজু পথে? আনন্দের স্তবে
মুগ্ধ তুমি। তবু বৃন্দাবনে জেনো থাকে তারি নাম
যে কৃষ্ণ, যে সয় জ্বালা। বাকি সবই দাম-বসুদাম॥

অন্য আকাশ

মানুষের পাখা নেই।
শূন্যতার পটে তাই নিজের হৃদয়
সামান্যই দেখে সে চিত্রিত।
অথচ মাটিতে জন্মে মাথা তার উঁচুতে, কাজেই
আকাশের প্রেমে নির্বাচিত।

এ ডাক কোনো না কোনো মুখোমুখি দিনে
টোকা দেয় মায়াবী আঙুলে,
হাতির উল্লাসে নেমে মনের দীঘিতে
জলক্রীড়া করে শুঁড় তুলে।

তখন থাকে না ভয়। সব অন্ধকার
অন্য কারো অস্তিত্বের ময়ূরকলাপ
মেলে ধরে। মেঘে মেঘে কাটে যতো বেলা,
মনে হয় একা নই আর!

এবং পৃথিবী আজ
যদিও গ্লোবের মতো ডোরাকাটা বিরোধী রেখায়,
সবারি পরমা গতি ঘরে,
দেখেছি তবুও কতো অন্তরীক্ষ পাশাপাশি মনে
—যখনি জানালা খোলে ঝড়ে।

যদি সে আকাশ পাই, মুখ দেখি প্রেমের দর্পণে॥

আগে কহো আর

এই কি যথেষ্ট নয়? এক তাল কঠিন পাথরে
আমি-যে সময়, স্বেদ, নাড়ির স্পন্দন, ভালোবাসা
মিশিয়ে গড়েছি স্বপ্ন; তুলেছি-যে নৌকোর ডহরে
স্মৃতির উজান ঠেলে জীবন্ত মাছের নগ্ন ভাষা;
অথবা, এদ্দিনে আমরা কুশীলব যেহেতু নাটকে,
নকল বুঁদির কেল্লা ভেঙে যারা সুখে মাতোয়ারা
তাদের দরবারে আমি ভাঁড় সেজে গিয়েছি-যে ব'কে—
আপাত হাসির নিচে রেখেছি-যে দারুণ ইশারা।

সেই কি যথেষ্ট নয়? তবু কেন বুকের গুহায়
দেখি এক ঋষি ব'সে আমাকে নিয়ত করে হোম!
আমি তো চাইনি মুক্তি আলমারিতে চোখের শোভায়
মাটির ফলের মতো। এগিয়েছি দুচার কদম
সম্মুখে আমিও। তবু এ কেমন কাজীর বিচার—
যে দেয় সে সবি দিয়ে শোনে শুধু: আগে কহো আর!

বাসর পোহালে ঘরে

যতোদিন যৌবনের প্রভুত্ব, পৃথিবী
ষোড়শী মেয়ের কৌতূহলে
আড়ে আড়ে চায়।
তারো পরে তাকে নিয়ে কাটে-যে জীবন
সে শুধু সম্ভব মমতায়।

কেননা সবারি আছে শুশ্রূষার হাত।
পাখি ফিরে আসে ডালে, মোহনার নদী
বেড়ে ওঠে গোমুখীর গুহাহিত ঘরে।
কেবল মানুষ কোনো ঈশ্বরের করুণা যেহেতু
পায় না, রাজত্ব নিজে গড়ে।

তাকে বলো প্রেম। কিন্তু তায়
ন্যায়দণ্ডে ও-হৃদয় যতো সাবালক
ততো কি দেখ নি সেই কঠিন খেলায়
তুমি এক সিংহের ক্রীড়ক !

এবং সবার চেয়ে দুরূহ যা, বলি—
অরণ্য নির্মূল হলে মাটি মরে, আর
মরু পা বাড়ায়।
বনস্পতি বাঁচে তাই অতিদূর গুল্মের শিকড়ে।
বাসর পোহালে ঘরে যেহেতু সংসার,
জাগা চাই বিচিত্র মায়ায়॥

দেখব, কী বাণী

বরং সহিষ্ণু হও,
বলেছিল রাত্রির আকাশ।
বরং প্রতীক্ষা কর—
গাছের আড়ালে পাখি, যুবতীর মন, শস্য, নদী
বারে বারে বলেছে জানি তা।

পতনের হিংস্র মজা পায়ে পায়ে রুখে
আমি তাই সার্কাসের দড়ির খেলায়
কাটালাম দীর্ঘ দিন।
চড়ুইয়ের শান্তি নিয়ে ধুলোর গোষ্পদে
মেজেছি পাখার ক্লান্তি !
গাধার চীৎকারে তবু কেন
শূন্য আজ ভেঙে পড়ে কাঁচের টুকরোয় !

জলের দু হাত দূরে মাছরাঙার মতো
থরো থরো পাখা নেড়ে স্থির হ'তে চেয়ে
কবে আর লক্ষ্যে যাব ?

রক্তে-যে রোদের স্বপ্ন মুছে মুছে আসে !
ধৈর্য আজ কাপুরুষ, প্রতীক্ষা নির্বোধ।
সুপক্ব ফলের মতো জীবনকে মুঠি ভ'রে নিয়ে
দেখব, কী বাণী তার শাঁসে ॥

যদি এ জীবনে ডুবি

আর ভয় পাব না, বরং
এই অন্ধকারে আমি ডুবে যাব আজ।
কেননা হৃদয় যার সমর্পিত, সেই
পায় শুনি নিখাদ স্ববাজ।

বাধা তো আছেই, থাকে চিরকাল, কার
স্তব্ধতা হঠাৎ বাজে আনাড়ির শ্বাসে ?
এদিনে ময়ূরপুচ্ছ একে একে খুলে
যদি-বা নিরভিমান হতে পারে কেউ,
প্রেম কি সহজে কাছে আসে !

তবুও যেহেতু দ্বিধা খরগোশের চোখে
শেয়ালের দাঁত হ'য়ে জ্বলে,
সবাই অশ্রুর কালি ঢেকে রাখে হাসির মোড়কে,
এবং মানুষ নয়, বন্ধু শুধু কাগজ, কুকুর—
তখন বীজের মতো একেবারে নিহিত না হলে
মমতার আলোকের স্বপ্ন বহুদূর।

মন যে উপোসী আজ। অমৃতের থালা
কোথাও মেলেনি এ সংসারে।
অথচ রাত্রির বনে ভালুকেও শুনি
মৌচাকে মাতাল, ভোলে মক্ষিকার জ্বালা।

যদি এ জীবনে ডুবি, যাব নাকি তমসার পারে !

মহাদেবের পটের প্রতি

বুঝি-না কী ক'রে হাসো। সংসারে তো এ-নেই তা-নেই—
কলকাতার পথে পথে ডি. এল. রায়ের সুরে বাঁধা
বন্তার কোরাস যেন! তবু তুমি তোলো না কানেই
কী বলে জীবন। প্রভু, এখনো কি হয়নি সমাধা
সময়ের দিনরাত্রি-ডোরাকাটা বাঘছালে ব'সে
জীবনের ইস্কুল পালানো? দেখ, কাঁদে-যে শিশুরা,
গৃহিণী কপাল কোটে স্বয়ংবরা বিয়ের আপশোসে,
ভিক্ষার জটিল পথে ঘুরে ঘুরে ষাঁড় হল বুড়া!

কী চাও? অমর, কিংবা পৃথিবীর মঙ্গলের ধ্যান
হৃদয়ে তোমার? (মরি, সিনেমার নায়ক কি তুমি—
যে-গল্পে ক চায় খ-কে, খ অথচ গ-বলতে অজ্ঞান!)
উদাসীন এ জগৎ মানে কি সে স্বপ্নের ঝুমঝুমি?
তুমি-যে গৃহস্থ প্রভু! প্রাণপক্ষী চায় দানাপানি—
ত্রিশূলে লাঙল গড়ো; কিংবা কুলি হও; বা কেরানী ॥

পাখিডাকা ভোর

একটি পাখির ডাকে
রাত্রিশেষ শুকতার সারেঙ্গী যেমন
বেজে ওঠে ছড়ের আঘাতে,
কাঁধের উপর দিয়ে প্রেমিকার ফিরে-চাওয়া-মুখ
যেমন আচমকা মনে খুলে দেয় অনেক কপাট,
আমরা পাইনি সেই তীব্র অভিজ্ঞতা,
আমাদের স্বপ্ন তাই কেবলি প্রয়াস—
পাথরের গাঁটে-গাঁটে বাঁধা ঝর্না যেন।

কৈশোরে ভেবেছি পূর্ণবয়স্ক মানুষ
রূপকথার দুরন্ত নায়ক,
আজ দেখি যৌবনের নষ্ট সম্ভাবনা
কনিষ্কের মুণ্ডহীন পাথরের প্রতিমূর্তি—
বিশাল, করুণ।

তবুও তো একদিন জেগে উঠতে হয়,
বুক পেতে নিতে হয় দুর্যোগের পাখার ঝাপট,
শিক্ষানবিশী ছেড়ে কঠিন জীবনে
সাবালক হ'তে হয় রক্তাক্ত ভুলের কাঁটাপথে,
প্রতিদিন মরে মরে একদিন বেঁচে উঠতে হয়।

সময় যে ছোটে বুনো ঘোড়া
যদি না লুটাতে চাই তীক্ষ্ণ অপঘাতে,
ব'সে থাকতে হবে ঝুঁটি ধ'রে।

রাত্রির খিলানে তাই প্রতিধ্বনি তুলে
আমরা চলেছি আজ,
আমরা চলেছি অন্ধকারে
মৃত্যুর দুয়ারে, জন্মে, পাখিডাকা ভোরে।

প্রতিশ্রুতি

যে কথা সবাই ভাবি কেন তা বলব না—
একই পরিচিত ছকে নানা ছলে করি আনাগোনা,
সে এক রহস্য, গ্লানিকর।

আমি যদিও অবশ্য
…হনার নৌকো চলে নিরাপদ একই ঘাটে ঘাটে;

কলুর বলদ ঘোরে ইচ্ছাহীন পথে,
তবুও জেলেরা দেখ মাছের সন্ধানে
উধাও নদীর মুখে লোনাজল আক্রমণ করে,
তবু অনভিজ্ঞ যুবা প্রেয়সীর কানে
জটিল কামনা দিয়ে প্রণয়ের ইমারত গড়ে।

এ জীবন প্রত্যহের প্রতিমুহূর্তের আবিষ্কার।
আমরা কেবলি হস্তলিপির খাতায়
চলি দাগা বুলিয়ে। কেবল
ভাঙা সাঁকো, পথে হাহাকার!

বরং নিজের কথা বলি।
হোক তা অস্পষ্ট, বেসরকারী।
মানুষের অভিমুখে প্রাণ যদি বাঁধা থাকে,
যেমন পাখির ডানা আপন শাখায়,
আকাশে কী ভয় আর
কী ভয় নিজেকে?

আমিও তোমারি কাছে ফিরে আসব
হে আমার রাজরাজেশ্বরী,
শুধু, সামনে কাঁটাজমি, অন্তহীন আবর্তন, তাই
পথ গেছে বেঁকে॥

আগন্তুক

ন' বছর পরে দেখা।
কথা বলতে পারেনি, কেবল
ব'সে ছিল, লোকটা মুখচোরা।

শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ তাকাল, প্রশ্ন করল, আর
ব'সে রইল চুপচাপ।
উঠে গেল কখন, জানিনে॥

ছেচল্লিশে দেখেছি রাস্তায়
কী এক মিছিলে, আর আজ এই দেখা।
ছিল ঢাকা না কোথায়
জেলে।
ফিরে এল এতদিন পরে।

বলল সে: কেমন চলছে
সাহিত্য, জীবন?
বললাম: কবিতা কিছু, ছোটগল্প, আর
নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই—
চলছে মন্দ না।

খানিক চুপচাপ,
স্তব্ধ,
ঘড়ির শব্দও শোনা যায়।

: আর কিছু? আর কি খবর?
: কখনো এগিয়ে যাওয়া, একটু তোলপাড়, ফিরে আসা
পথ খোঁজা, অপেক্ষা, এবং
কবিতা কয়েকটি, কিছু ছোটগল্প, আর
নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এই—

: এই শুধু? আর কিছু নয়?
ন' বছর— দীর্ঘ ন' বছর!

আবার চুপচাপ,
স্তব্ধ,
বুকের শব্দও শোনা যায়।

ঘরের দেয়াল ঘেঁষে
কাঁপতে কাঁপতে স'রে এল চোখের সম্মুখে।
হাওয়া ভারি হ'য়ে উঠল।
বুকচাপা অস্বাস্তিতে ভাবতে চেষ্টা করি—
কী পেলাম, সত্যি কী পেলাম!

তারপর কখন সে যে উঠে গেছে
খেয়াল করিনি।
হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি— একা আমি
অন্ধকারে। চমকে উঠি নিজেরি নিশ্বাসে।

কেন এরা ঝড় নিয়ে আসে—
ন'ড়ে ওঠে মনের শিকড়!
পুরোন আরাম থেকে খ'সে পড়ে বাসাভাঙা খড়।

পড়ন্ত বিকেলে

পড়ন্ত বিকেলে একবার
ফিরে দেখি পিছনের পথ,
একবার দেখি ভবিষ্যৎ।
মনে হয় সময় বুঝি-বা
যৌবনের প্রান্তে প্রৌঢ়-হতে-যাওয়া মানুষের মতো
আপসের শান্তি পেতে চায়।
মুখে তার ছিল যতো ভাঙনের নদীর কর্কশ
পাড়ের খাড়াই আঁকাবাঁকা,
মনে যতো ধনুকের চাপ,
সবি ছেলেভুলানো ছড়ার মতো
হ'তে চায় স্নিগ্ধ, স্বয়ংবশ!

সারাদিন ছিল রুক্ষ ব্যস্ততার জ্বর—
সে কি পাবে প্রেমের চিকিৎসা ?
থেমে যাবে লুব্ধ প্রতিযোগিতার ঝড়,
ত্রাস, অশ্রু, ঈর্ষা ?

তবুও কেন-যে ছবি সুসমঞ্জ হ'তে হ'তে
একটি বেয়াড়া তুলি শিল্পীর নিহিত উত্তেজনা
মেলে ধরে ভয়াবহ রঙে !
বিকেলের রাঙা আলো মাঠ নদী গাছের পাতায়
মায়াঞ্জন স্পর্শ দিয়ে, তবুও হঠাৎ
ক্রেমের কোণায় ভাঙা মন্দিরের ধাতব ত্রিশূলে
দপ ক'রে জ্ব'লে ওঠে।

স্মৃতি তার বেঁধে সারারাত ॥

হ'য়ে-ওঠা

বর্ষার মহিষমেঘ
ছুটে আসে আবণ্য আকাশে,
জল কাদা ছিটিয়ে আবার
চলে যায় দিগন্তের পারে।

তারপর আশ্বিন ; জ্যোৎস্না
সারারাত শাদা শাদা মেঘ
খরগোশের মতো খেলে নিরুদ্বেগ নীলের চাতালে।

এমনি স্বচ্ছন্দ শান্তি উঠে আসত যদি
সময়ের আবর্তনে কলের হাতল ঘুরে ঘুরে,

জীবন সহজ হত— রাস্তায় ফিরি-করা বায়স্কোপ যেন-
কেবল ছবির পরে ছবি।

আমরা যে-দিনে আছি সে বড় কঠিন।
গীতিকবিতার মতো তার কোনো স্বরলিপি নেই।
এ যেন প্রবল কোনো শিল্পীর খাতায়
নানা কাটাকুটি রেখা, টানা-টানা, ভাঙা,
অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট আভাস,
প্রতিটি মোচড়ে যার ছায়া ফেলে যায়
দ্বন্দ্বের রক্তাক্ত ইতিহাস।

চাই না, চাই না, তবু সহজের ছুটি।
সংঘর্ষের শিখরে সংঘর্ষ
ভাঙুক, আমরা তবু বাঁচি, হ'য়ে-উঠি, জয় করি—
আমাদের থাক এ যন্ত্রণা, এই হর্ষ॥

বরং গভীরতর

রাস্তার রেলিঙে বাঁধা নদী-নৌকো-নারকেল সারির
আহ্লাদ দিত ছবি, কিংবা খেয়ালী চিঠিতে দু' লাইন
উদ্ধৃতির উত্তেজনা, শুধু এই ইচ্ছা যদি ভিড়
করে, তবে কী পাবে এখানে? কোনো বেতাল বা জিন
আমার দখলে নেই। কিছুই পাবে না অনায়াসে।
না ফুল, না গান, স্বপ্ন, সৃষ্টির দলিলে বকলম
চলে না। বেহুলা তাই মৃতকে ফিরাতে নিজে ভাসে—
ভীষণ সুন্দর নাচে স্বর্গ টলে, পরাজিত যম।

এসো না এখানে তবে উদাসীন বিদেশীর মতো
ডায়েরীর আমন্ত্রণে। মন্দিরের পাথরে, গুহায়

কিন্নর, দেবতা, নারী, অতীত-মোমযে মূর্ছাহত।
পরিচিত পথে পথে দৃশুশস্য জাগে, ঝ'রে যায়।
বরং গভীরতর অন্ধকারে এসো, অন্তঃশীল
দেখ কী ঐশ্বর্য জ্বলে স্বপ্নময় রেডিয়ামে নীল॥

সাম্প্রতিক

একদিন এমন ছিল
ফাল্গুনের বেপরোয়া কোকিলের মতো
শূন্যকেও সে বাজাতো সুরেলা চীৎকারে।
শহরের ঘরবাড়ি রেডিওর খুঁটির মাস্তুলে
ভেসে যেত উধাও সমুদ্রে।

তারপর স্বপ্নের ধ্যান ভেঙে গেল। সমস্ত প্রতিমা
একে একে জড়ো হল গঙ্গার কাদায়।
যে-মন তারার রাজ্যে মণিমুক্তা কুড়াত, সে দেখ
ফলের দোকানে শুকনো আপেলের সাজে
কামনাকে ঢাকে তার লালনীল কাগজে, রাংতায়।

তবু কি স্মৃতির চাষ থামে একেবারে?
প্রেমের উদ্ভিদগন্ধ, জীবনের ফসলের সাধ
ছিল যার মনে, সে কি চোখ বেঁধে যেতে পারে আর
যে কোন খোঁয়াড়ে?

দেখ তার বুকে কান রেখে—
এখনো ঘটেনি সর্বনাশ,
এখনো শুনতে পাবে সে বোবা সমুদ্রে
লোনাজল ছিঁড়ে ছিঁড়ে শুশুকের শ্বাস॥

উদ্যোগের ইতিহাস

মাঘের সকালে তাজা রোদ
কাছিমের পিঠ মেলে আধোডোবা নৌকোর গলুইয়ে
পড়ে থাকে, পৃথিবীর ইচ্ছার ভিতর।

আমি তার ব্যাকরণ বুঝিনি এখনো।
সুখের মুহূর্তগুলি প্রায়-বোবা প্রেমিক-প্রেমিকা,
নিশ্বাসে, নীরবতায়, চোখে চোখে কথা বলে যায়—
বাঘের থাবায় আমি খুঁজিনি সে হরিণের স্বাদ।

বরং নিজেই কতো অবুঝ খাঁচায়
টিয়ার চীৎকারে দিন কাটিয়েছি, তার
পাখার ঝাপট কানে বাজে।
স্মৃতির নদীতে আজো দেখি বারে বারে
যখনি জালের শব্দ ছেঁড়ে অন্ধকার
লাফানো মাছের তীক্ষ্ণ আতঙ্কের রেখা জলে ওঠে!

তা বলে আনন্দ কিছু পাইনি তা নয়।
মাঘের সকালে আমি কাছিমের ব্যাকুলতা নিয়ে
এ-জগৎ পান করি রৌদ্রের গেলাসে।
তবু সে রভস ভুলি প্রতিদিন। ঠিক যেন তুমি!
যতোক্ষণ কাছে পাই, হীরকের শুদ্ধ অনুভূতি—
দূরে গেলে সব শূন্য, আবার প্রস্তুতি॥

কিছু যে ঘটে না

আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই,
আশাই জীবন।
কিন্তু আঙুরের গুচ্ছ নাগালের বাহিরে, কাজেই
সবাই মাঝারী ভালো খুঁজি।

এ তো ঠিকই
সুগৃহ, সঞ্চয়, স্বাস্থ্য,
নীরোগ সন্তান আর সমঝদার বউ
একান্ত বাঞ্ছিত। তবু
জীবনে যা ঘটে তাকে বলা যায় বোবার সঙ্গীত—
রক্ষা যে শ্রোতারা আজো কালা!

কিন্তু কোনো কোনো দিন
স্তব্ধতাও মেঘে মেঘে ঘন
ভীষণ উদ্যত মনে হয়;
নিষ্কম্প গাছের চূড়া অকস্মাৎ কথা বলে ওঠে—
ভয়ের প্রতীক্ষা ছিঁড়ে একঝাঁক পাখি
আচমকা নীলের শূন্যে উড়ে যায় পাখার ঝাপটে

তেমনি আকাঙ্ক্ষারো এই ঘরোয়া দেওয়াল
(যদিও সে খাড়া, তবু মৃত!)
স্বপ্নের শিশুর হাতে হঠাৎ কখন
দারুণ বেলুনশ্বাসে যেন বিস্ফারিত।

কিছু যে ঘটে না তাই বিস্ময় তখন!

শস্যের মাটি-যে

রেকাবে পায়ের চাপ লেগে
হয়তো অনেক কথা ছোটে উচ্চৈঃশ্রবা,
লাগামের টানে তবু বাণী থাকা চাই।
না হলে উৎক্ষেপে তার মোছে পথ, জীবন অথবা।

বিলের কিনারে শাদা বক
পৃথিবীকে ধ্যান করে মাছের শরীরে,
সে তা পায়। বনের হরিণ
কান পেতে ছেঁকে নেয় চিতার আওয়াজ।
শুধু মানুষেরি মন শিশুর খেলায়
চোঙে-বাঁধা লালনীল কাঁচ—
যতোবার নড়ে, ততো ভেঙে যায় বহুবর্ণ ছক।

অথচ গানের মতো স্থির অলজ্জায়
নিজেকে না মেলে দিলে, হৃদয়ের শ্বাস
কার অন্ধকারে আর ছড়ায় সুরভি?
কে বলো অন্ধের হাতে তুলে দেয় হাত,
হোক সে প্রেমিক কিংবা কবি।

তাই তো আকাশে মেঘ জমে যদি, আমি
সারাদিন বাঁধি মাঠে আল।
জানি আগাছার চারা বাড়ে বন্যতায়,
শস্যের মাটি-যে কিছু স্বপ্নের কাঙাল॥

বাপ্পার জন্যে

আমারো সংসার আছে। কিন্তু কতো দিন
এ-নয় ও-নয় বলে চলে গেছে সুসময় খুঁজে।
যেন ছায়াহীন কোনো আতপ্ত বালুতে
দাঁড়াবার অবকাশ নেই,
পা-রেখে পা-তুলে শুধু ছুটে যাওয়া সামনে চোখ বুজে

আর, নানা পথশ্রমে যেটুকু আহার
পাওয়া যায় মনে, সেও কৃপণ, দুর্বল।
তাড়িত বিড়াল হ'য়ে দুঃস্বপ্নের ছায়া যেন তাই
রাত্রির পাঁচিলে ঘুরে অন্ধকার বিঁধেছে কেবল।

এ দিনে হঠাৎ আমি একটি শিশুর
মুঠিতে জগৎ খুঁজে পেয়ে
জেনেছি, হৃদয় বাঁচে আকাঙ্ক্ষার মূর্তিময় দেহে—
যাকে হাতে ধরা যায়, বুকে নেওয়া যায়, যাকে পেলে
আমরা উত্তীর্ণ তথাকথিত সে ঈশ্বরের স্নেহে।

ফলভারে নত চারাগাছে
নতুন সৌন্দর্য আমি একদিন দেখেছি। জীবনে
দুরন্ত আস্বাদ তার ভোরের আলোয়
দেখি আজ অন্ধকার মনে
দারিদ্র্যের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সোনা হ'য়ে নাচে॥

কোন পরিণামে

পাওনি অনেক জানি, শরীরে ও মনে।
যেমন নিভাঁজ শয্যা, বারান্দা, কুকুর;
কিংবা বিনা সুদে ঋণ, এমন কি রান্নায় সুস্বাদ।

তাই তুমি তৃপ্তিহীন। সোনা ব'লে যা নিয়েছ লবি
হয়তো ঝকমকে তবু কিছু তাতে থেকে গেছে খাদ।

তা বলে কি নিঃস্ব, স্মৃতিহীন ?
অজানা ফুলের গন্ধ হাতে নিয়ে হাওয়া
কখনো বন্ধুর মতো আসেনি কি ঘরে ?
রাত্রির বৃষ্টির গানে ধ্বনিত হওনি রোমে রোমে ?
অবারিত শস্য, মাছ, মানুষ কি টানেনি আদরে !

পেয়েছ স্বপ্নের চোখ, যন্ত্রণার স্নায়ু।
কতো মুহূর্তের কাঁটা জলে ওঠে তারার হীরায়।
একবারো সে ঐশ্বর্য দেখাবে না জানালায় ব'সে ?
তাহ'লে কী দেবে পরমায়ু !

তুমি-যে পাথর, পশু, রূপকথা নও
দাও তার অভিজ্ঞান। তুমি যে রক্তের কাছে দায়ী !
না হলে নারীর প্রেম কেন বুকে নিলে ?
কেন অশ্রু-আকাঙ্ক্ষার ঘরে এসে তবে
বলে যাবে শুধু নাই, নাই !

নীরজার ইতিকথা

যে যাই বলুক, আমি নীরজাকে এই
উচ্ছল আড্ডার স্বাদু সমালোচনায়
জাহান্নামে পাঠাব না, গোপন ঈর্ষার
জ্বালা ঢেকে বিচারের উদার হাসিতে
বলব না : পাতালের শেষ ধাপে নেমেছে সে, আর
তোমরা সবাই গেছ জিতে।

হাঁ, আমি দেখেছি তাকে আউট্রাম ঘাটে, সিনেমায়,
মার্কেটে, ট্যাক্সিতে, বহু পরিবর্তমান পুরুষের
পাশাপাশি, শুনেছি আমিও তার হাসি
বিচূর্ণ কাচের শব্দে হাওয়ায় সুতীক্ষ্ণ হ'য়ে ঝরে।
যে ছিল লতার মতো স্পর্শভীরু, কোমল, সে আজ
ডালে ডালে ফণা মেলে ধরে।

'তুমি অরুণেশ, বঙ্কু, রাজীব, কানাই,
স্মৃতি কি অতোই ক্ষীণজীবী?
মনে পড়ে সেইদিন, যখন মূল্যের পরিমাপে
এদিকে নীরজা একা, অন্যদিকে সমস্ত পৃথিবী!

সে বুঝি বিলাস শুধু! কিম্বা যৌবনের
বন্য অহমিকা তার দলিত পৌরুষ ফিরে পেতে
নীরজার নাম মাত্র খুঁজেছে কেবল!
যে মেয়ে হাসে ও কাঁদে, জীবন্ত যে নিজের বোঁটায়
তার সুষমার চেয়ে দলগুলি ছিঁড়ে নিতে বুঝি
সেদিন মেতেছ হিংস্র প্রতিযোগিতায়।

তাই অরুণেশ তুমি বঙ্কুর হৃদয়ে
বীভৎস। বঙ্কুও পোড়ে রাজীবের মনে।
কানাইয়ের অনিদ্রা তো রাজীব। এবং
সবাই প্রেমের খোঁজে ঘুরে মর ঘৃণার বন্ধনে।

এ নাটকে পরিণাম হল যা হবার।
সবাই পেয়েছ নীরজাকে।
অথচ ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তেও দুঃস্বপ্নের মতো
অন্য কারো চোখ জেগে থাকে।

সে আঁধার তোমাদেরি নিষ্প্রেম হৃদয়।
যে মেয়ে জ্বালাত শত দীপাধার একটি হাসিতে,

জনে জনে দেখেছে সে, ফিরে গেছে, শুনেছে কেবল
'ও তার উচ্ছিষ্ট প্রেম অচল মাটির পৃথিবীতে।

আজ সে কোথায় দেখ। তোমরা সবাই
'পোষমানা জীবনের সুখের আঁচলে
নিরাপদ, ফিরে গেছ ঘরে।
আর ঐ উন্মাদিনী নীরজা একাই
নির্মম লোভের দাহে প্রাণ দেবে ব'লে
নেমে গেল আগুনের ঝড়ে॥

পাইলট অজিত নাগ

যে আকাশে সূর্য ওঠে, অথবা যেখানে
সকালে সন্ধ্যায় মেঘে পাহাড়, পশুর, মানুষের
অলৌকিক মূর্তি জাগে, যাইনি কখনো
সে বিপুল খেলাঘরে। দেখেছি কেমন ওড়ে পাখি
শূন্যকেই বুকে বেঁধে; মাঝরাতে একা
লণ্ঠন জ্বালিয়ে চাঁদ হেঁটে পার হয়
তাবাব জোনাকি-জ্বলা নীল তেপান্তর—
আর ঘরে ব'সে স্তব্ধ মনে
বুঝেছি ছুটন্ত ঘোড়া অকস্মাৎ লাগামের টানে
কী দুরন্ত গতি রোখে বাঁকানো গ্রীবায়।
আমাদের ইচ্ছা, অশ্রু, তাই চিরদিন
হৃদয়ের আবিষ্কারে খোঁজে এক নিজস্ব আকাশ।

কেউ কি পেয়েছে সেই অবগাহনের
রক্ত-অনুরণিত আস্বাদ?
পাইলট অজিত নাগ চৌরঙ্গীর ঘনিষ্ঠ আসরে
বলল সেদিন তার বৈমানিক অভিজ্ঞতা: কানে

গতির গর্জন, দোলা, মিচে মেঘ, কখনো বা মাটি,
ছবি-ছবি মাঠনদী, শহর, সমুদ্র, বাড়িঘর,
এবং ইত্যাদি। শুনে ভেবেছি এবার
লোভ দ্বন্দ্ব রিরংসার হিংস্র ঘোলা জলে
হয়তো বা শতদল ফুটবে— হৃদয়
তুচ্ছের সংকীর্ণ সীমা পার হলে, একা
হয়তো উদ্যত প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর আভায়
জীবনের অন্ত মানে দেখবে। কিন্তু না,
পাইলট অজিত নাগ হেসে হেসে বলল : যেহেতু
সময়কে তুড়ি দিয়ে ছুটি, তাই পৃথিবীর মুঠোয়
ধরেছি, যেমন এই তরল আধার—
ব'লে এক চুমুকেই সব শূন্য, এবং তখনি
ভাঙে সে ঝনঝন শব্দে কাচ, যেন কাহিনীর শেষ,
যেন অতো সহজেই জানালায় এসে ফিরে যায়
শতচক্ষু রাত্রির আকাশ!

পাইলট অজিত নাগ ভাবে কি জীবন পরিহাস!

রঘুবাবুর যুক্তিতে

জয়ন্তী, আবার আমি ছবি আঁকছি! অবাক হ'য়ো না
ভুলিনি দুঃখের দিন, চাকরিতেও নিইনি বিদায়।
যোগবালা বিদ্যালয়ে অঙ্কন-শিক্ষক আশী টাকা
এখনও আনবে, শুধু আরো এক বাঁচার উপায়
শিখেছে সে, তাই ধুলো ঝেড়ে
ইজেলে নতুন রঙ ঢালে, আর চলে ছবি আঁকা।

একদিন, জয়ন্তী, তুমি বলেছিলে— ভোলোনি নিশ্চয়-
'জীবন কী সাধারণ; কিছুই হলো না!'

তারি প্রতিধ্বনি বুকে বেজেছিল, আর দীর্ঘশ্বাসে
সমুদ্রশ্বসিত রাত্রি অনিদ্রায় হ'ল অশ্রুলোনা।
যেন আলো-আঁধারির বনপথে ঘুরে স্বপ্নময়
হঠাৎ এলাম নগ্ন রোদে-পোড়া মাঠের সন্ত্রাসে।

কেটেছে অনেক কাল। তুমি আর আমি
কেউ কারো মুখোমুখি না-দাঁড়িয়ে, নিয়তিকে মেনে,
চলেছি সমান্তরাল, একটি আকাশে দুটি পাখি।
দুজনে মেলার মতো কোনো শাখা আছে কি না-জেনে
ক্লান্তির দূরত্বে বাঁচি প্রতিদিন। কী হ'ল সহসা,
দেখ, সে শূন্যতা আজ জাগে রূপে, মুছে যায় ফাঁকি।

আজকে রাস্তায়, জানো, বহুদিন পরে
পিছনে শুনেছি দূর শৈশবের ডাকনাম, আর
রঘুদাকে দেখি আসে দু'যুগ ডিঙিয়ে।
সেই হাসিমুখ, রোগা, দীর্ঘদেহ হাড়ের পাহাড
কাছে এসে ধরে হাত — আর মেষশাবকে ঈগল
যেমন উড়ায় বেগে, আমাকেও গেল ঘরে নিয়ে।

কতোদিন পরে দেখা। প্রাথমিক কুশল প্রশ্নের
পরে জানা গেল ক্রমে, চাকরি আর ব্যবসাতে মিলে
ছ'বার শিকল কেটে পেশা তার অরণ্যে উধাও।
অধুনা খোঁজার পালা চলছে। তা হোক এ নিখিলে
কর্ম তো সবারি আছে, ক'রে যেতে হবে, কিন্তু ভাবো,
এ-অভাব মেটে যদি, পাবে-কি সত্যি-যা তুমি চাও ?

হঠাৎ আশ্চর্য লাগে। বানপ্রস্থ এল কি চল্লিশে ?
রঘুদা আবার বলে, 'তন্ত্রমন্ত্র জানি না, শুধুই
একটি জানালা আমি খুলে রেখে দিয়েছি, গুমোটে
তাই বেঁচে আছি। তাই সকালের খুশি নিয়ে দু-একটি চড়ুই

উড়ে আসে, আমারো এ বুনো গাছে দেখি
আনন্দে স্বপ্নের কুঁড়ি ফোটে '

কৌতূহল সীমা ছাড়ে, প্রশ্ন করি তাই—
'কী করে তা ঘটে ?' শুনি রঘুদার সলজ্জ গলায়
ধীরে ধীরে ভাষা জাগে, 'নাটকের নেশা ছিল, তা তো
জানোই। নাটক করি। আর তারি চলায়-বলায়
মুক্তি পাই। কেটে গেল অর্ধেক জীবন। কী পেলাম,
হিসাব কষি না। কিন্তু স্মৃতির করাতও

রক্তাক্ত করে না মন। শিখেছি— কেবল
আচমকা প্রবেশ আর করতালি নয়, আত্মদানে
প্রতি মুহূর্তের বলা-না-বলার সমস্ত মহিমা
বাঁচে শুধু চরিত্রের শেষের প্রস্থানে।'…
জয়ন্তী, এসব শুনে মনে হল বাঁচি, ছবি আঁকি।
প্রথমে তো মাটি, শেষে যা রাখি তা আমারি প্রতিমা ▮

ইয়াসিন মিয়া

দেখা হল সব্জির বাগানে।
তখন বিকেল। ছোট চারাগুলি ইয়াসিন একা
দ্রুত পরিচর্যা করে। শূন্য দিকসীমা।
অবনীর ডাকে ফিরে তাকাল যখন
রৌদ্রবিচ্ছুরিত মুখে ঘামে-ভেজা জ্যোতির আভায়
ফোটে যেন ঋষির মহিমা।

এ-ছিল অকল্পনীয়। বাজেপোড়া অশথে পিপুলে
হয়তো বা কিশলয় জাগে, কিন্তু মানুষে কি অতো
দারুণ বিষের জ্বালা পার হ'য়ে নীলকণ্ঠ কেউ !

অবনী তো আজো সেই বৈশাখের ঝড়ে
বাসাভাঙা ডানা তার আকাশের পরিক্রমা থেকে
ফেরাতে পারেনি কোনো শাখার উপরে।

একই গ্রামে ছিল দুইজনে
বহুদিন। অবনী যুবক, ঘুরে ফিরে
অবশেষে এখানেই পাঠশালার ম্লান শিক্ষাব্রতী।
ইয়াসিন চাষী, তার একক সন্তান রহিমের
বিবাহের স্বপ্নে ভোলে মৃতদার প্রৌঢ়ের বিষাদ।
এরি মাঝে এল সেই ভয়ঙ্কর ক্ষতি।

দৃশ্যের আড়ালে বুঝি আরো কিছু আশ্চর্য ঘটনা
ছিল, অবনীর মন উচ্ছল ঢেউয়ের
নিচে কী জটিল স্রোতে জীবনের দুদিকের পাড়
ভাঙে গড়ে তা জেনেছে, নিজেকেও সরিয়ে রাখেনি
'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে' শিখেছে কবে, আর
এখন সে হাতে নিল তীক্ষ্ণধার ছেনি!

খবরের কাগজে সবাই
পরবর্তী ইতিহাস জেনেছে, হাজার
চাষীর খামারে ওঠে তেভাগার উপক্রান্ত সাড়া।
সেদিন দুলালগঞ্জে হিংস্র ক্ষুধা খাণ্ডবের রোষে
জ্ব'লে গেল কতো ঘর— একটি কিশোর
সূর্যাস্তের সে তিমিরে প্রাণ দিয়ে হল সন্ধ্যাতারা।

এখনো স্মৃতির পটে দেখা যায় রহিমের দেহ—
রক্তপরিপ্লুত, মৃত, চোখে তবু কী এক জিজ্ঞাসা!
অন্ধকারে জোয়ারের মতো তার ক্ষুব্ধ ঢেউয়ে ঢেউয়ে
দড়ি ছিঁড়ে ভেসে গেছে অবনীর মন।
দীর্ঘ দু'বছর জেলে ভেবেছে, কী বলে ঐ গ্রামে
[illegible] কী অভিযোগ জানাবে কেমন।

আর, প্রথমেই দেখা তারি সঙ্গে যার
সর্বস্ব গিয়েছে, যার জীবনের আশার শিকড়ে
পরুষ কুঠার নেমে শুকিয়েছে উদ্ভিন্ন মুকুল।
মনে হল ফিরে যাবে, কিন্তু ঐ শিরাওঠা হাতে,
শ্বেত কাশগুচ্ছ চুলে, বসার ভঙ্গিতে, দ্রুত কাজে
কী করুণ স্নেহ ছিল, দেখে চোখ পারেনি ফিরাতে।

কাছে গিয়ে ডেকেছে সে, 'ইয়াসিন মিয়া,
ভালো আছ?' 'খোদাতালা রেখেছে যেমন!'
'আমি অপরাধী!' 'সে কি! সকলেরি আয়ু
এক নয়। বড় কথা, কে কেমন কাজে তা ফুরায়।
আল্লার বিচারে জানি রহিম করেনি কোনো ভুল।
কবে এলে মাস্টারমশায়?'

অবনী বসল ঘাসে। একথা-সেকথা
ব'লে অবশেষে তার মনের কপাট
খুলেছে সে, 'বল তো কী ক'রে
পার হ'য়ে এলে ঐ দুঃখের সাগর?
বল তো কী ক'রে আছ বেঁচে?'—
একালের নচিকেতা খোঁজে যেন রহস্যের জড়!

কতোক্ষণ দূরে চেয়ে ভাবে ইয়াসিন।
তারপর অপ্রতিভ হাসি টেনে বলে,
'সে কথা জানি না। শুধু কাজ করে গেছি প্রতিদিন।
যখনি অস্থির মন, জ্বালা ধরে বুকে,
কাজে ডুবে পেয়েছি আরাম।
এ ছাড়া আর কী আছে! আদাব।' 'সালাম।'

ঝুঁকে ঝুঁকে চলে যায় আসন্ন আঁধারে
শীর্ণ দেহখানি তার। কাজে ডুবে পেয়েছে আরাম?

দুটি পাখি উড়ে গেল ; আলো জ্বলে কার আঙিনায় ।
পৃথিবী চলেছে । হেসে অবনী জানাল মনে মনে—
এ জীবন এত স্বচ্ছ, বাণী তার এতোই আদিম,
অথচ মানুষ তার লিপি ভুলে যায় !

হরিলাল পাখিঅলা

বাড়িতে ময়না ছিল । তারি এক অসুখের দিনে
ডাকা হল সে বুড়োকে । নাম হরিলাল,
পাখিঅলা— কয়েকটি খাঁচায়
চন্দনা ময়না টিয়া বজরিগার নিয়ে মাঝে মাঝে
এ রাস্তায় যেত ; তারি শুশ্রূষায় পাখি
ভালো হল ; সেই থেকে সে এসেছে কাজে ও অকাজে ।

বলত অনেক কথা । পাখিরা কেমন
শৌখিন, কেমন তারা থাকে বনে, আর
যারা ভালবাসে এই প্রকৃতির অহেতু বিলাস
রঙের, স্বপ্নের, তারা কেমন প্রেমিক !—
একগুচ্ছ ফুল, জ্যোৎস্না, নারীর হৃদয়, কিম্বা পাখি
যে-মনে তোলে না সাড়া তাকে শত ধিক্ !

কিন্তু কিছুকাল পরে একদা সে এসে
বলল, 'সস্তায় দেব, বাবু, সব পাখি
নেবে ?' ভাবি, রসিকতা ! বলি তাই হেসে,
'হঠাৎ এ ইচ্ছা ? সবি চোরামাল নাকি !'
শুনে সেও হাসে আর বলে ক্লান্ত স্বরে,
'কাজ নেব বিড়ির দোকানে ।
এ শহরে সকলেরি মন থেকে উড়ে
চলে গেছে পাখি, মিছে ঘুরে ঘুরে কী পাব এখানে !'

এই বলে হরিলাল আবার রাস্তায়
নেমে গেল। আর তাকে দেখিনি, কেবল
মনে পড়ে চোখ তার— স্বপ্নময়, আশ্চর্য সরল,
গ্রামের আকাশ যেন। বাঁধা আজ সে কোন খাঁচায়

রাস্তার ছেলেটি

একটি পয়সা চেয়ে বাসের স্টপেজে
বাড়াল সে হাত, দেখি চোখে তার হরিণের ত্রাস!
বয়স ছ-সাত, গায়ে কিছু নেই, কালো
খড়িওঠা দেহে যেন ওঠে-নামে প্রতিটি নিশ্বাস।

হঠাৎ কী মনে হল, তার হাতে ভালবেসে কিছু
পয়সা দিয়েছি, কিন্তু সে শুধু দেখেছে তাতে তামা—
যা তাকে বাঁচাবে— যেন মানুষের এ অরণ্যে তার
স্নেহ নয়, হাসি নয়, বুঝি-বা কান্নাও
নয়, হিংস্র অনাদরে তাই সে কেবল
ধমনীতে শোনে— খাও, খাও!

রজবালির স্বপ্ন

সারাদিন কাজ শুধু। উত্তুরে হাওয়ায়
অঘ্রানের বেলা কাটে পরের উঠানে
আঁটি-বাঁধা ধান ঝেড়ে, তুলে দিতে পরের গোলায়।
চুলে জমে খড়কুটো, মনে অবসাদ।
জমিজমা নেই তার, প্রায়-বুড়ো রজবালি জানে
হা-ঘরে হা-ভাতে বলে এ তল্লাটে সে আজ প্রবাদ।

সকলেই চেনে তাকে। তিন বিবি গেছে আগে পিছে
ছেলেরা উধাও সব, কে কোথায় পেতেছে সংসার।
তবু সে-ই ভিটে ধ'রে বসে আছে মিছে,
উদয়াস্ত অশ্রুঘামে জোটে আজ দুমুঠো আহার।

কী আশ্চর্য তবু এই একদা-চাষীর
স্বপ্নের আহ্লাদ! রাত্রে চোখে যেই ঘুম নেমে আসে,
মুহূর্তে সে পায় যেন যুবাব শরীব ;
আর ধমনীর স্রোতে অভীপ্সার রঙে অবিরত
দেখে—নারী নয়—ধান, ধানের পাহাড় চারিপাশে,
মাঝখানে সে রয়েছে স্থির
সোনালি সর্ষের ফুলে নেশাধরা মৌমাছির মতো!

অতিদূর আলোরেখা

যেন কোনো বনের কিনারে
আজ নয়, অন্য জন্মে, আমি যৌবনের
সহজ নেশায় মেতে, সারাদিন চড়ুইভাতির
আনন্দের কোলাহলে কাটিয়েছি বেলা—
বিকেলে কী ঘুম এল, হঠাৎ জাগার পরে দেখি
ওরা নেই, ভেঙে গেছে খেলা!

ছড়ানো কাগজ, পাতা, শূন্য টিন, নেভানো উনুন,
বহু পোড়াকাঠ, ছাই, এমনকি শালের মঞ্জরী
যা তোমাকে দিয়েছি সকালে, সব ফেলে
সবাই ফিরেছে, তুমি— তুমিও গিয়েছ সহচরী!

মুহূর্তেই পৃথিবীর চেহারা বদলায়।
চারিদিকে ঋজু শাল, হাওয়া নেই, শূন্যতার বুকে

গম্ভীর মাদল বাজে ঘন অন্ধকারে।
    মনে হল একা আমি, উৎসবের দিন
        অতিদূর আলোরেখা, কোনো ঘরে আর স্মৃতি নেই,
            [illegible] জ্বলছে একেবারে।

গত-অনাগত

আহা, আমি যদি তার মনের প্রান্তরে
    পাশাপাশি বসে শুধু ঘাসের স্পর্শের
        কোমলতা পেতাম স্নায়ুতে!
আহা, একবার যদি শাড়ির জামার
    মোহজাল খুলে, ত্বক, রক্তের দাহের
        ওপারে হৃদয় পারি ছুঁতে।

সে মেয়ে আমারই কাছে। আমি তবু তার
    বুকের জজ্বার ঢেউয়ে সমুদ্র-আঁধারে
        কখনো দেখিনি ধ্রুবতারা।
ঘুরেছি কেবল তাই লবণ-হাওয়ায়—
    জোয়ারের ফসফরাসে দেখেছি শুধুই
        শতচক্ষু ভয়ের ইশারা।

তবু কি ছিল না তার কামনা? ও-মনে
    নেই কি নিজেকে মেজে বিলিয়ে দেব
        রাজেন্দ্রাণী সুখ?
আহা, প্রেম চোখে তার চিত্তল হরিণ
    হ্রদের ওপারে, আমি পিছনে স্থবির
        [illegible] রাত্রির [illegible]।

ডুবে যদি যেতাম, তবুও

ডুবে যদি যেতাম, তবুও
মনের দিগন্তে চোখ
উত্তরের দিকে
জেগে থাকত। হাওয়া
শুকনো পাতা উড়িয়ে, মাঠের
রোদে ধুলো ছুঁড়ে, ঘুরে ঘুরে
জানলার কব্জার জঙে নাড়া দিয়ে, কেঁদে,
ফিরে যেত, আর
ছিঁড়ে যেত কতো চিঠি,
ঝরে যেত ফুল,
কতো-না সোনার তরী
রাশি রাশি ধান
ভেসে যেত, জানি।

তবুও, যেতাম যদি ডুবে,
এক নীল প্রতীক্ষার আলো
মুখের উপরে বুকে রক্তের কণায় কল্পনায়
জেগে থাকত,

জেগে থাকত প্রেম
সমস্ত দুঃস্বপ্ন-অশ্রু-জীবনধারণে হাহাকারে
খুঁজত নতুন মাঝি, যার পাটাতনে
আপনি ঈশ্বরী ব'সে
একটি হাসিতে
আবার সেঁউতি, মন, করে দিত সোনা॥

শিল্পের ধমনী

জন্মের চেয়েও মৃত্যু দয়াময়ী। কারণ মৃত্যুই
স্মৃতি, চলমান তৃষ্ণা, শরীরের পার ঘেঁষে ঘেঁষে।
এবং জীবন, সে তো প্রতিদিনই বিদেশ-বিভূঁই,
যদি-না সে অনস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় ভালোবেসে।

আমি তাই দুঃখ খুঁজি, যে আমার নিয়তির মতো
কেন্দ্রশায়ী চেতনায় বসে আছে স্তব্ধ অনালোকে।
অগ্নিহীন দীপে তার অঙ্গারিত বাসনার ক্ষত
বুঝি-বা আমারই স্পর্শে জ্বলে শুধু শিখার ঝলকে।

জন্মে আমি কী পেয়েছি? জননী ও জায়ার হৃদয়—
স্তন্যের সুনিদ্রা আর বন্যতর ঘুমের আসব।
বরং মৃত্যু ও ভালো; প্রতিদিন বাঁচাব সময়
প্রতিটি মুহূর্ত যেন মৃত বলে করি অনুভব।

কারণ যা নেই তাই স্মৃতি, তাই সুপেয় পিপাসা;
এবং তৃষ্ণাই শান্তি, কারণ সে গতির সরণি।
অনেক মরণে মরে তবু যদি মেটে এই আশা—
আমিও বেতালসিদ্ধ ছুঁয়ে যাব শিল্পের ধমনী॥

স্বতোৎসারে, নিজে

সেই যন্ত্রণাই শুদ্ধ, বুকে যার ডাকিনী-চিৎকার।
কারণ সে দ্ব্যর্থহীন, দোলায় না সন্দেহের টানে।
নির্ঘুম রাত্রির স্নায়ু ছেয়ে যায় যেমন আঁধার
তেমনি নিশ্চিত সে যে, নেমে আসে স্বপ্নের শ্মশানে।

আমি আর সে মুহূর্তে স্মৃতি দিয়ে পাই না আমাকে।
মুছে যায় পূর্বাপর, শুধু এক তীক্ষ্ণ অনুভূতি
চেতনার নদী থেকে আরো দূর চেতনার বাঁকে
অদৃশ্য নৌকোর মতো রেখে যায় শূন্যের প্রস্তুতি।

তখন, তখনি আমি বিদ্ধ ওই যন্ত্রণার দাঁতে ;
সময়ের মণিবন্ধে ছিন্ন হয় সহসা জীবন—
সহসা ছড়ায় প্রাণ রেণু-রেণু নক্ষত্রের রাতে ;
অথচ এ-মরদেহ দেখি দূরে পশুর মতন।

নাও তার অশ্রুরক্ত, হে আমার কঠিনা ঈশ্বরী।
করুণা ক'রো না, ফিরে এসো না আবার রক্তবীজে।
পান করো, চূর্ণ করো বঞ্চনার চিত্রিত গাগরী—
যদি-বা তাহলে আমি ভ'রে উঠি স্বতোৎসারে, নিজে।

বিপরীত ছবি

সবাই সোহম্ হবে এই স্বপ্নে বসে শবাসনে।
ব্যাকুল নিষেধ যতো, স্বেদ, ক্লেদ, সমস্ত বিকার
কেউ কেউ পার হয় ; কারো কারো জীবনমন্থনে
দেখা দেয় নীল জ্যোৎস্না, পূর্ণতায় স্নিগ্ধ পূর্ণিমার।
তারাই সার্থক, বৃত ; তাদেরই উদার বরাভয়
আনে কামনার শস্য ; জন্ম-জন্ম যুগলে-যুগলে
শুষ্কতায় এ সংসারে রোধ করে যতো ভূমিক্ষয়,
সে শুধু তাদেরই টানে উদ্বেলিত জোয়ারের জলে।

আমারও সাধনা তাই ; কিন্তু আমি বুকের ভিতরে
কোনো পূর্ণিমার আলো পাইনি প্রবল আবির্ভাবে

তবু এই না-থাকাও সর্বব্যাপী তৃষ্ণার শিখরে
ভীষণ মন্ত্রের মতো অন্যাবস্থা হয়ে আজ কাঁপে।
কান পাতো সে আঁধারে ; দেখো সেই বিপরীত ছবি :
শূন্যেরও কোটালবানে ভেসে যায় জীবন-জাহ্নবী।

হোক না সে শয়তান

জঘন্য এই রাত্রি দিন
অসহ্য তার গ্লানি,
এরই মধ্যে কী আশ্চর্য
কেউ রাজা কেউ রানি
ইচ্ছেমতো মুখের পেশী
যাদের অধীন, ছদ্মবেশী,
মখমলে কিংখাবে তারাই
পেয়েছে জলপানি।

তাই বলে কি দুঃখ জাগে ?
মুখস্থে কি সাধ ?
নৃসিংহকে রক্তে পুষে
সাজবে কি প্রহ্লাদ ?
সকাল থেকে সন্ধ্যা যাকে
নিষিদ্ধ পাপ জড়িয়ে থাকে,
সুযোগমতো তার কি মানায়
ওই সন্ধি-সংবাদ।

হাঁ, আছে এই বুকে আমার
দারুণ অভিমান,
ইতিহাসের পাতায় তবু
পাব নিজের স্থান।

দেবদূতেরা স্বর্গে নিখোঁজ,
এই নরকে তবুও রোজ
একটি শিখা দেবত্ব চায়—
হোক না সে শয়তান

পুণ্যের বেতন

পাপের বেতন মৃত্যু। কিন্তু পুণ্য, তারো কি জীবন
যাত্রার রাজার মতো কেটে যায় সখিদের নাচে ?
দেখনি সে শূন্যতার কেন্দ্রে যতো পাতে যোগাসন
ডাকিনীর হিংসা ততো উঁকি দেয় আনাচে-কানাচে ?
সে তো শুধু পৃথিবীর প্রীতিমুগ্ধ মানুষের কানে
সুভাষিতাবলী নয়, সে যে নিজে নিজেরই আশ্রিত !
গবেষণাগারে তার বকযন্ত্রে আগুনের টানে
যদি-বা অমেয় সত্তা কোনোদিন ওঠে স্বয়ংবৃত।

পাপের বেতন মৃত্যু। কিন্তু পুণ্য, তারো তো মাথায়
কাঁটার মুকুট, তারো দুঃখলীন স্বপ্ন-রাজধানী।
তবু সেই তিল তিল যন্ত্রণার দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
যে আশা রূপকে গল্পে জেগে থাকে নিত্য দুয়োরানী
তারই মুখে শান্ত হাসি, বিষপাত্রে শুধু তারই মন
অমৃতের অভিলাষী। আর তাই পুণ্যের বেতন।

অস্থিরতা

অস্থিরতা জমছে ক্রমে ক্রমে।
আবার যেন স্থিতির ভিত
টলছে অনিয়মে।

অন্ধকারে স্রোতের বেগ
যদিও আজ অনুল্লেখ,
পাড়ের মাটি ভোলে কি সেই
ক্ষণিক বিভ্রমে ?

শান্তি নেই পুরনো ব্যবহারে।
যদিও সেই প্রাচীনা প্রেম
টানছে বারেবারে।
ভালোবাসাও শূন্য, যদি
না ঘটে তার পরমাগতি,
বিদ্ধ ক'রে মর্মমূল
দেখে সারাৎসারে।

অস্থিরতা, কোথায় নিয়ে যাবি ?
কোথায় তোর হৃদয়-স্বসা
একক অনুভাবী ?
আদিম পিতা বুকের হাড়ে
ইচ্ছাকে তার গড়তে পারে।
আমরা যে আজ অন্ধ, বধির,
এবং অ-মেধাবী।

তবু এখন রক্তে এ কার শ্বাস ?
আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষার
বিবাহে একি ত্রাস !
তীক্ষ্ণতার সে সংরাগে
ধাতুর বুকে মূর্তি জাগে।
অস্থিরতা, কোথায় নিবি ?
সে কোন পরবাস ॥

অর্ধনারীশ্বর

ভালোবাসাই যন্ত্রী এবং যন্ত্র একাধারে,
বেজে ওঠাই আমার পরিচয়।
বয়ঃসন্ধি সকাল থেকে পড়ন্ত যৌবনে
শ্রুতির পথে তাই খুঁজি অন্বয়।
তুমি এবং তোমরা যারা এলে বারম্বার,
কৃতজ্ঞতায় সবার প্রতি জানাই নমস্কার।
বিরল দিনে আকস্মিকের রঙ ধরেছে শুধু,
মেলেনি সেই ওতপ্রোত লয়।

গানের আগে যে শূন্য সেই অনন্তীতির পটে
সুর বুঝি এক দৃশ্যাতীত তুলি,
আনন্দিত যন্ত্রণার উধাও টানে টানে
ফোটায় তার স্বেচ্ছাচারগুলি।
মৃদঙ্গের আঘাত সে যে সমান্তরাল বাধা,
শেখায় তাকে কেন এবং কীসের জন্যে সাধা,
অন্ধকার তেপান্তরে প্রদীপশিখা যেন—
অকম্পিত দিশারী অঙ্গুলি।

ভালোবাসাই যন্ত্রী এবং যন্ত্র একাধারে,
আমি শুধুই প্রতিশ্রুত গান।
তুমি এবং তোমরা যারা এলে ক্রমান্বয়ে
মূল রাগিণীর পাওনি যে সন্ধান।
সে সুর যদি পেতে, তোমার ইন্দ্রসভার নাচে
দেখতে কেমন মৃত প্রেমিক মুহূর্তেকেই বাঁচে,
সঙ্গতি কী মন্ত্র, দেখ, স্বয়ং মহাকাল
অর্ধনারীশ্বরেই খোঁজে ত্রাণ॥

এবার ভ্রূমধ্যে এস

বস্তুর আড়ালে ও কে জলধারা হাতে নিয়ে নারী
আকাশগঙ্গায় ঢেউয়ে ভেসে চলে অশ্রুত নিস্বনে !
এই আমি, এই বৃক্ষ, এই অন্ন গৃহ তরবারি
ডুবে যায়, দ্রব হয়, অন্য উপলব্ধির প্লাবনে।

সে বড় অদ্ভুত। সে কি পলায়ন ? সে কি ফিরে আসা ?
নাকি সে ঈক্ষণ, শুধু ফিরে দেখা ? যেমন কবিরা
কাব্যরচনার কালে পান করে সকল পিপাসা—
নিজেই বাগান, নিজে মক্ষিকা এবং মধুক্রীড়া !

আহা সেই একাকার। একাকার, কেননা তখনি
ইন্দ্রিয়ের সব তার এক দুই তিনের সংখ্যায়
যদিও আক্রান্ত, তবু স্পন্দমান সব স্বরধ্বনি
এক দুই তিন নয়, মিশে যায় সুরের বন্যায়।

অথচ স্বতন্ত্র আমি, লোভে কাঁপি, ঈর্ষায় স্বকীয়
পরাজয়ে ছিন্নভিন্ন ; একে চাই ওকে করি ঘৃণা ;
আকণ্ঠ জঞ্জালে ডুবে ক্রমে নিজে নিজেরও অপ্রিয়—
এ পোড়া পাহাড় আর বুকে যেন বইতে পারি না।

কোথায়, কোথায় তুমি জলধ্বনি, ঝরো-ঝরো ধারা !
নয় সেই প্রেম যার হাঁটুজলে ডোবে না শরীর।
এস তীক্ষ্ণ শরাঘাতে অর্জুনের উচ্ছ্রিত ফোয়ারা,
মিটাও ভীষ্মের তৃষ্ণা রণস্থলী-শায়িত শান্তির।

বস্তুর আড়ালে তুমি আকাশবাহিনী দিকে দিকে।
অণুর অণুতে তুমি ভোগবতী পাতালনন্দিনী।
মুক্তির সমান্তরালে চিরকাল এই পৃথিবীকে
অমৃতের আশা দিয়ে চিরকালই রয়ে গেছে ঋণী।

স্বপ্ন করো, মগ্ন করো, করো প্রাণ আভার বসতি ;
কেন্দ্রে টানো, কামনায়, কামাগ্নির ধাতুর ঘর্ষণে।
অশ্রু ঘাম রিরংসার দাহে তুমি এস স্নিগ্ধ জ্যোতি,
এবার ভ্রূমধ্যে এস মমতার তৃতীয় নয়নে॥

রাস্তাটা

রাস্তাটা লাফিয়ে ওঠে
পাহাড়ের ত্রিকোণ চূড়ায়।
রাস্তাটা ঝর্নার বেগে নামে তেপান্তরে।
অরণ্যের মায়াবী ভূগোল
এঁকেবেঁকে ছিন্ন করে।
দিগন্তের ছিলাটানা ধনুকের চাপে
রাস্তাটা কোথায় ছোটে,
কে জানে কোথায়!

রাস্তাটা ঝাঁপিয়ে ঢোকে স্বপ্নের গুহায়।
আদিম তৃষ্ণার অন্ধকারে
জিহ্বা রাখে, ছেঁড়ে স্নায়ুজাল।
রাস্তাটা গর্জায়, নড়ে,
কেঁপে ওঠে আমার পাতাল।

অথচ আমি যে আজো ঘরে!
জীবনের কতো সাধ, শিল্পরতি, প্রেম
বাঁধা আলিঙ্গনে,
রাস্তাটা তবুও কেন দিনরাত্রি রক্তের ভিতরে
শ্বাস ফেলে, বিঁধে থাকে মনে!

চড়ুইয়ের প্রতি

চড়ুই, বাচাল কেন? ছ-ছ' আনা বিক্রেতার মতো
শ্রুতি-নিরপেক্ষ তোর বাজে-বকা থামে না বারেক।
অবশ্য এমনও হয়, মাঝে-মাঝে হৃদয়ে সন্ত্রস্ত
একান্তে উদাসী ব'সে নিস তুই সন্ন্যাসীর ভেক।
কিন্তু তোর চক্ষু দুটি— সুকৃষ্ণ, গভীর— যতো দেখি,
কী এক তৃষ্ণার চাপে পোড়ে যেন নিজেরই ভিতরে।
সে কি শুধু অন্নচিন্তা; আশ্রয়ের বিভীষিকা সে কি?
অথবা পুরুষ-ইচ্ছা, প্রণয়ে যা কৃপাভিক্ষা করে?

অথচ, চড়ুই, তোর প্রণয়িনী নয় তো কঠিনা;
সহস্র আশ্লেষে তার গ্রীবাভঙ্গি করে না শাসন।
আকাঙ্ক্ষার শীর্ষে বুঝি মিশে যায় প্রেম আর ঘৃণা?
একটি মুহূর্তে তারা আধাআধি ভেঙে যায় মন!
তখন, বাচাল কিম্বা মৌন তুই যা হোস, চড়ুই,
আমারও কবিতা দিয়ে যেন তোরই দ্বিচারণা ছুঁই॥

পঞ্চতন্ত্র

১

শেয়ালেরা বিঘোষিত হিংসার আঁধারে
গলিত শবের মাংস খোঁজে।
তবু তারা ভীষণ পণ্ডিত!
কুমিরের সাত ছানা মেরে চুপিসাড়ে
থাকে তারই জিৎ।

কিন্তু তার ভবিতব্য শেষ অঙ্কে এসে
দিল এ কি আশার ছলনা!

পরিবৃত মহাভোজে অতিবুদ্ধি হেসে
খেলো যেই ধনুকের গুণ,
নিজেরই লোভের দাঁতে নিজে হল খুন।

২

সেই কাক আর তার তলানি কুঁজোয়
যতোক্ষণ ছিল ব্যবধান,
তৃষ্ণা তার যাতে সেই জলরেখা ছোঁয়
ঠোঁটে করে টেনে এনে পাথরের নুড়ি
হয়েছে সে ইচ্ছার সমান।

কিন্তু সে সুতৃপ্ত যেই, মাংস নিয়ে ঠোঁটে
শেয়ালের স্তুতিতে নির্বোধ
নিজেকে জাহির করে ক্রোধের দাপটে।
সে মুহূর্তে, সর্বস্বান্ত, বোঝে কার দোষে
সাধ-সাধ্যে দুঃসহ বিরোধ।

তবু চিত্তে অন্ধ আকুলত

কিছুই পাইনি বলা ভুল।
ব্যক্তিগত যশ, অর্থ, নারী
ইত্যাদি যা দেখাবে আঙুল
সবই তার ছিল না ফেরারী।
উল্টিয়েছি অনেক পাথর
সুযোগের সাধ্যমতো চাষে,
ভেসে গেছে বস্তুময় ঘর
কখনো বা প্রেমের উচ্ছ্বাসে।

না, অনেক পেয়েছি জীবনে ;
স্বপ্ন, ঘৃণা, অশ্রু আর হাসি।
বহিঃস্থ ব্যক্তির শূন্য মনে
এ সংসারে থাকিনি প্রবাসী।
তবু চিত্তে অন্ধ আকুলতা
খোঁজে আজো সঙ্গ…স্পর্শ…কথা।

নদী ঢেউ ঝিলিমিলি নয়

যা ভাবো তা নয়। নদী
ঢেউ ঝিলিমিলি নয় ; স্রোত
দাঁতে কাঁটা, ধ্বসে পড়া মাটি, মূল ; স্মৃতি
বেঁকে যাওয়া, মোড় নেওয়া
জলধারা, ভেঙে ভেঙে চলা…

কিম্বা আরো হিংস্র। রাত্রি
নিরস্ত্র জঙ্গলে ; একা
গাছের শাখায়, বাঘ
নিচে ; দুটি চোখ
বৈদূর্যের জ্বালা ; অন্ধকারে
স্নায়ুযুদ্ধ ; মিনিট…মিনিট…

তারই কাছাকাছি। প্রেম
তুলনামূলক নড়াচড়া ; কাল
রক্তে জিহ্বা দিতে চায় ; আমি
মিনিটের পরে অন্য মিনিটে শতাব্দী লাফ দিয়ে
শূন্যে বাজি ধরি।

ঢেউয়ের দাঁতে

দেখ না দেখ, আছেই তবু—
ম্যামথভারী দালান-কোঠা, ঘর-বাড়িতে
সৌদাগন্ধী হুকুমনামায়
প্রতিষ্ঠানে
দেয়াল-ঘড়ির পেণ্ডুলামের দোলায়, এবং
মাইল মাইল
রেললাইনের ইস্টিশানের ব্রিজ-পেরোনোর
দেশান্তরে
পাহাড় কিম্বা শহরে বা মেলায়, হাটের
সবল ভিড়ে
আছেই তবু
কুটিল কালো গুমরে ওঠা
না-দেখা এই ঢেউয়ের ছোবল।

তলার মাটি কাটছে, তুমি
কান পাতোনি ?
পায়ের নিচে ;
ঢেউয়ের শব্দ ,
খেলার মাঠে, একলা ঘরে
টেলিফোনের গল্পে কিম্বা
রেস্তোরাঁর গানের শিসে
আছড়ে পড়ে ঢেউ ; মানুষের
অশ্রুঘামে, গলাবাজিতে
জুলুম, এবং
হালছাড়া আর পাশ ফিরে ঘুম-সাধার মধ্যে
ঢেউয়ের চতুর শাবল মাটি
কাটছে, মাটি ফাটছে ; তুমি
হাওয়ার ডাকে কান পাতোনি ?

কান পাতোনি নিজের মধ্যে ?

ভালোমন্দে ঢেউয়ের ঝাপট ;

ফুলের নাম, কি

পাখির রঙ, বা

নারীর হাসির সব পছন্দে

ঢেউয়ের জলকল্লোলে আজ

পারের সাঁকো সঙ্গপাতী ;

ছবির মধ্যে, প্রেমের মধ্যে

ঘৃণা এবং ক্রোধের মধ্যে

ঢেউয়ের খাঁড়া ঝিকিয়ে উঠছে

ছিটকে পড়ছে আসল-মেকি।

সকল বাক্যে, সকল স্বপ্নে প্রশ্ন এখন ;

ঢেউয়ের দাঁতে

চেঁচিয়ে উঠছে সময়,

তাকে বকে পাওনি ?

আমিও জেনো

আমিও জেনো বইয়ের মতো

দুই মলাটের ভাঁজে অনেক

রাত্রিপোড়া ঘণ্টা ঘড়ি, ভালোবাসার

বুকে ত্রিশূল ঘৃণার এবং শিশুমুখের

দুধে-দাঁতের ঝিলিক, আশার ঘরে হঠাৎ

নতুন মায়ের হেসে ওঠার সকাল নিয়ে কালো হর

পাতার 'পরে নীরব পাতায় প্রতীক্ষিত।

আমিও জেনো ইতিহাসের

স্তম্ভ-দেউল টেরাকোটার

শিল্পলোকের দীপ্তি এবং বাঁকা ছুরির
দরদালানে মশাল-আলোয় আর্তনাদের শেষে নাচের
নূপুরতালে ঢের হেসেছি, শতাব্দীপার
অশ্বক্ষুরের ধুলোয় জয়ের লুণ্ঠনে নীল তেপান্তরে
অনেক কেঁদে কাঁটাঝোপের ভাঙা পাথর ঘিরে গ্রামের
খড়ো ঘরের চষা মাঠের ঢের দেখেছি মাইল মাইল
স্তব্ধ এবং স্পন্দিত দিন।

আমিও জেনো লোকের মতো
এই আমাদের দেশের মানুষ গঞ্জে হাটে মাটির বুকে
যেমন কাটায় জীবন, আমি তাদের মতোই
আধখানা মন অন্ধকারে কাদায় জলে ডিবের আলোয়
হিজিবিজি ছায়ায় রেখে হঠাৎ কখন
দেখি সবার খেতের মাঝে পা-নামিয়ে লোহার থামে
ঈশান থেকে নৈঋতে ওই দিগন্তকে বিঁধে সটান
নিযুত ভোল্ট বিদ্যুতের শক্তি স্বাধীন
হাই-টেনশান তারে,
আমিও সেই অবাক নতুন স্বপ্ন চিনি
বিস্ফোরিত অন্ত মনের।

টিকটিকি

অথচ তুমিও আছো। দু' কোটি বছর
ডাইনোসোর জন্মভূমি লাফিয়ে এখন
আমার দেয়ালে ঝুলে
ইতরের নগ্ন কৌতূহলে
পেতেছ দূরবীন। তুমি
কাকে করো উপহাস? কার্টুনের মতো
আমার প্রেমের আয়োজনে

হেলানো বর্তুল ছাঁচা কোনাচে ছবির
এত প্রহসনে কেন দৃশ্যের উদর
করো বিস্ফোরণ ? আমি ভুলে যেতে চাই
অশ্লীল জিহ্বার ওই ভেজা অন্ধকারে
বোমারুর মতো ক্রূর আনাগোনা। তবু
সব স্বপ্নে, কবিতায়, টেবিলের রজনীগন্ধার
উপরে রয়েছ কেন স্থির
আদিম ক্ষুধার মুণ্ডে, টিকটিকি, তুমি
দগ্ধ হীরকের কালো চোখ !

নাম

নাম বড় মোহময় ; তবু
নাগরদোলার টানে
বাজারের এই ওঠানামা
সতত চঞ্চল করে ; সদাই বিহ্বল
নিজের অতীত ব'য়ে ; কে জানে কখন
ফায়ারিং স্কোয়াডের মতো ভবিষ্যৎ
দু' চোখে রুমাল বেঁধে
ছুঁড়ে দেয় দ্রুত বিস্ফোরণ !

নাম বড় ভয়ঙ্কর ; ওই
সেলিহ আগুনে আমি
অশ্রু আয়ু ছুঁড়েছি অনেক ; দিনে দিনে
বেড়েছে দহন শুধু, জ্বালার বলয়।
আগ্রাসী ক্ষুধায় তার লুফে নেয় যেহেতু সকলি
আমাকে গ্রাসের আগে
সে ডাকিনী বেঁধে আমি তাই
ঘরের বাতির মতো বিনীত আলোর
রেখে যেতে চাই— ভালোবাসা॥

শৃঙ্গজয়ের ইতিকথা

এ তো একদিন নয়, আমি
রোজই চড়ি পাহাড়ে ; কাজেই
নিশান-ওড়ানো ফোটো অযথা ; আমার
স্মৃতি নেই, সাফল্য অচল।
আমি যে-পাহাড়ে উঠি
চূড়া তার ভেঙে ভেঙে যায়,
থাকে শুধু উপরে ওঠার আয়োজন।

আসলে পাথরও নেই,
হয়তো পাহাড়ও অনুমান।
এমন অস্থির চূড়া, অসমান, সতত চঞ্চল
নিরাকার, তবু স্থূল, চাঙড়ে চাঙড়ে নড়াচড়া
পাহাড়ের মতো নয়, তবু প্রতিদিন
দেখি তার হাতছানি, ত্রিকোণ ধবল।

আমি এ পাহাড়ে উঠি প্রতিদিন, পিছল পথের
পতনে প্রতিটি দিন খসে পড়ি খাদে।
তুষার-কুঠার নেই, শিখরে ওঠার
লাঠি দড়ি জুতো নেই, পাহাড়ও উধাও।
শুধু আছে আরোহণ ; বিজয়-বিহীন
চূড়ায় দাঁড়ানো ; দ্রুত পটক্ষেপ ; আর
রক্তাক্ত আবার আরোহণ॥

মুখ দেখি কাঁসের আলোতে

শস্য প্রতীক্ষায় থাকে,
বোবা বীজ পাথুরে চাতালে
নিষ্ফলা ; মাটিকে আমি
কোপাই, লাঙলে বিঁধি
জল ঢেলে কাদা ছানি,
রোদ্দুরে ওল্‌টাই ; দিনে দিনে
বদলায় নিঃশব্দ গূঢ় গবেষণাগারে
জড়ের চেতনা ; ক্রমে
মাটি কথা বলে ;
ভরে মাঠ শ্রমের ফসলে ।

আমি মাঠ ছেড়ে যাব আকাশে ; উধাও
ওড়ে এরোপ্লেন , ভেবে ছাখো
গতির শিরায় তার কেমন গণিত ,
দ্রুত প্রপেলারে, পাখা, পুচ্ছ-তাড়নায়
বেতারে রেডারে শত জটিল আলোর
স্থইচের লাল-নীল বোতামের চোখে
ঝড়ের ঝাপটে, হাওয়া-শূন্যের থাবায়
সে আমার কালঞ্জয় তৃষা—
তৃপ্ত করে আমারই মনীষা ।

হে আমার অধ্যুষিত দেশ ।
মাটি ও নদীতে তুমি,
বৃক্ষে তুমি, শস্যে ও সেবায় ;
তুমি আছ যন্ত্রে বাষ্পে বিদ্যুতে খনিতে,
গন্‌গন্‌ বয়লারে তুমি, কর্মের চাকায়—
তবুও তোমাকে আমি পাই না কেন-যে ?
আছি কার খোঁজে ?

সেকি তুমি মাঠ নও, গাছ নও,
নও জলধারা ?
নও শুধু অন্ন, নও কেবলি নির্মাণ ?
যন্ত্রের পিছনে মন, লাঙলের পিছে
মানুষ, মানুষ তুমি, চেতনা, হৃদয় ;

তুমি স্মৃতি, অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ ইতিহাস
পানিপথে, পলাশিতে, ব্যারাকপুরের
তোপের আগুনে, ক্রোধে, আর যুগে যুগে
ঘর বাঁধা, বুকে টানা, পথে পথে হাঁটা
ঢেউয়ের উত্থান আর পতনের মতো
ক্রমাগত, যুগপৎ, সঙ্ঘর্ষে সবল
খণ্ড খণ্ড কামনার সমগ্র ভুবন
ভেঙে গড়ে ধাবমান, হে মানুষী দেশ,
চলন্ত স্বপ্নের ওই দ্রুত খরস্রোতে
মুখ দেখি কীসের আলোতে ?

মোহিনী আড়াল

[অংশ]

॥ ১ ॥

তেমনি জাগরণ—যেন ব্যস্ত শত রেললাইনের
এদিকে ওদিকে ছোটা, কাটাকুটি কিম্বা কোণাকুণি
জংশন স্টেশানে ; সেই ঘর বাড়ি, ছুটন্ত দিনের
ভাঙাচোরা মন্তাজের অন্তহীন বিচিত্র বুনুনি ।

তেমনি জাগরণ— যেন স্বপ্নে পদ্মা, বিচিত্র সংসার ,
ধকধক স্টীমারের মধ্যরাতে হারানো যৌবন ।

আর স্মৃতি টর্চ জেলে খোঁজে ভিসা-পাসপোর্ট তার,
হকার্স কর্নারে এসে জোড়া দেয় দ্বিখণ্ডিত মন।

স্মৃতি মানবিক ঋতু ; নিসর্গেরই মতো বারে বারে
মাঘের জানালা খোলে ; ঘরে আনে ফাল্গুনী বাতাস ;
সময়ের পাতা তাই মাথা কোটে ম্লান ক্যালেণ্ডারে ;
ইচ্ছার আবেগে স্মৃতি হো হো হেসে ভোলে দীর্ঘশ্বাস।

তাই তো এমন বাঁচা, ঘর বাঁধা ! মৃত শতাব্দীর
শিল্পের মমতা চোখে এঁকে দেয় মানুষী মহিমা ,
অন্ধকারে ডুবে তবু স্বপ্ন জ্বালি আকাশবাতির ,
তাই চারু-অমরতা সত্বপাতী আমাদেরও বীমা।

ওগো বনস্পতি, তুমি মঞ্জরীতে সেজেছ নতুন।
চঞ্চল মক্ষিকা, তুমি মৌচাকে রেখেছ মধুকণা।
ধন্য ! তবু দিতে পারো অরণ্যের বিবিধ প্রসূন
একই বৃন্তে ? একই মধু গত-অনাগতের দ্যোতনা।

আমরা সময় বাঁধি, বুকে টানি বিরূপা প্রকৃতি।
একদা যা বাধা, আজ উত্তরণে জয়ের নিশানা।
সুন্দর আসলে তাই, সংগ্রামে যা দূর যৌথস্মৃতি।
সমস্ত ললিত বোধে জাগরণই মূলের ঠিকানা।

সোমেন, ঘুমিয়ে নাকি ?
জেগে আছ ? আমি শহরের
দূর প্রান্তে এ নিশীথে
জেগে আছি, বড় বেশি জেগে একাকীর
গভীরে মানুষ খুঁজি। আমি হতাশার
পুকুরে তলিয়ে যেতে যেতে
খুঁজি, দাম, হেলঞ্চের ভিতরে হঠাৎ

পায়ের নিচেই মাটি পেয়ে
ভেসে উঠছি। আমি
জানি বিষমতা আছে ··
ভালোবাসা নয়,
মিহি ভদ্র ঠাণ্ডা চতুরতা
কুকুরের মুখে বল ছুঁড়ে
সময়ের পাশাপাশি কেবলই ছোটায়·
স্নায়ুর আরামে আজ
সব প্রিয় নামগুলি
ফুল নয়,
সারি সারি গুব্‌রে পোকা,
ব্যস্ত নড়াচড়া···
জানি, দিনে রাতে
মস্তিষ্কে কেবলি উকো
ধাতব নিষ্ঠুর,
ছেদহীন দাঁতে-দাঁত ঘষা ,
মনের ভিতর থেকে
থাবা তুলে লাফ দিতে চায়
জন্তুর বিকার
জানি পৃথিবীর হানাহানি
কেবলি নীরক্ত করে
রুচি, সজীবতা, ভালোবাসা ,
দুমুখো সাপের মতো
আপনারই ক্ষয়ে
গ্রাস করে মৃণ্ডের আহার·
মনে হয় নেমে আসে
স্থির দ্রুত কৃষ্ণ যবনিকা···

হঠাৎ উজ্জ্বল ও কী দিক-চক্রবালে ?
উঠেছে নতুন তারা ?

ছুটন্ত হাউই !...
মহাকাশ-যান ও যে,
মানুষ, মানুষ।

নিচে লোনা সমুদ্রের ঢেউ,
জটিল সংসার।
চারিদিকে ঘন নীল
অভ্র-নীরবতা।

কথা কও শূন্যের হৃদয়।
কথা কও বোবা ভবিষ্যৎ।...

আকাশ-হ্রদের বুকে
শতদল পাপড়ি থরে থরে
ফুটে ওঠে—
চেতনা, মানুষ!

সোমেন, আশ্চর্য হব—
যদি কোনোদিন
তোমারো বুকের নিচে
নিভৃত ভ্রমর
মাথাকুটে মরে? কোনোদিন
তুমিও হঠাৎ, একা, তেমাথার মোড়ে
মনে মনে বল : কোন্ পথ?

॥ ১০ ॥
কেউ যেন বলেছিল, 'আসি'।
ঝাঁপি খুলে দেখাবে সে খেলা।

শেষে কি জোটালো সেবাদাসী ?
স্নান করে স্মৃতির অবেলা
সে আজ কোথায় পরবাসী !

সে আজ কোথায় পরবাসী ?
পথে তার বেলা গেল মেঘে ।
গলায় আছে কি তার লেগে
লোভ ঈর্ষা দুদিকে সাঁড়াশি ?

অথবা ঘুমিয়ে আছে, জেগে !
লোভ ঈর্ষা দুদিকে সাঁড়াশি ।
পদাঘাতে ফাটে তাই প্লীহা ?
অথবা সে টাকারই বিনাশী
খোশামোদে মোক্ষ অভিলাষী ।
পরিণামে জমেছে অনীহা ?

নাকি সে টাকারও অবিনাশী
ছলনার পায়ে খোলে মন ?
তারি ডাকে অন্ধ অচেতন
সাড়া দেয় নিঃসঙ্গ বিলাসী
হৃদয়েও প্রত্যুদ্‌গমন ।

কেউ যেন বলেছিল, 'আসি' ।
আসেনি, শুনেছি শুধু গলা ।
বুঝি-বা আমারই পাশাপাশি
ঝিকিমিকি তার ভেসে চলা ।
অথচ সে আজো পরবাসী !

তাহলে এবার
এসো, কান পাতো—
সিঁড়ি আর আঙিনার ওপারে ধুলে

শোনো পদশব্দগুলি। শোনো
রক্তের প্রথম সম্ভাষণ—
ছ হাজার বছরের অবচেতনের
আদিম সূর্যের নদীতীরে
ব্যাকুলতা, 'মোহিনী আড়াল।
হিরণ্ময় পাত্র খুলে ফেল,
চোখে রাখো চোখ।'

ওগো অন্তরীণ প্রেম,
আর কবে মানবিক শ্রুতির ভাষায়
হবে উদ্‌ঘাপিত ? এক
বহু হতে চায়, সে তো মমতারই গূঢ় জাগরণে।
হৃদয়ে প্রবেশ কর, প্রীত হও, হে প্রেম আমার,
সব কপাটের বাধা, ভাঙা কড়িকাঠ,
হোক অরণির স্তূপে তোমারই শিখায়
আয়ু, জ্যোতি, ওজসের জনসমাগমে
উর্ধ্বশির, স্বাহা॥

এই জন্ম, জন্মভূমি

[অংশ]

এ একটা অস্থির দিন,
এ একটা উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধি।
চতুর্দিকে তুলকালাম,
কেবলি যায়-যায় প্রতিধ্বনি।
অথচ কেন-যে যায়, যেতে থাকে, পূর্বাপরহীন
কেন ছেঁড়ে সময়ের গ্রন্থি ?
একি শুধু ভ্রান্ত উচাটন ?
একি নগ্ন অতিশয্যে যৌবনের পেশীর উল্লাস ?

ঐ যে অনন্ত যাত্রা
পুত্রকন্যা
দ্বিতীয় জীবন,
ঐ আমাদেরই ঘরে কতো-না কিশোর—
দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে,
ওরা তো উঠেছে বেড়ে
আমাদেরই অন্নে
স্বপ্নে
বুকের ভিতর ;
কেন মৃত্যু-ছিনিমিনি তাতে ওরা গতি ?
আগুনে পাথরে দ্রোহে ওঠে ঐ হেসে !
এ কি শুধু প্রাণ দিয়ে প্রাণ নিয়ে মরীয়া বিলাস ?
এ কি ছেলেখেলা শুধু, এ কি
নির্মম, নির্মম, মূঢ়,
আত্ম-পরিহাস ?

তাহলে এখানে এস।
আমার পায়ের
মাটিতে দাঁড়াও, দেখ
এক-একটা দিনের স্নায়ুকেন্দ্রে
কী তুমুল তোলপাড়।
তাহলে এখানে এস,
এক-একটা ধারণা হাত দিয়ে
তুলামূল্যে নেড়ে দেখ।
এক-একটা বিধান
কালাতিক্রমণভ্রষ্ট ফসিলের মতো
এ জীবন করে জাদুঘর।
তাহলে এখানে এস,
প্রতিষ্ঠান
.সংঘ

দেখ ঐ ভূমিকম্পে
মৃত
জরদ্গব
আত্মার পচনে আজ কেমন উলঙ্গ।

অচল বিংশতি এই!
দেশে ও বিদেশে
আজ শুধু পিছুটান
শুধু চাপা দেওয়া—
যৌন অসুখের মতো গোপন বিকার।
অথচ চেতনাকেন্দ্রে শতাব্দীর শেষে
অণুর তড়িৎ নৃত্য,
আকাশের পারে মহাকাশ
একই সঙ্গে ছোঁয়নি কি এসে?

সময় দুদিকে। ঐ
পিছনে তোমার
ক' কোটি বৎসর, নাকি তরঙ্গে তরঙ্গ—
অন্ধকারে ঢেউ ওঠে পড়ে;
জড়ের স্পন্দন থেকে অ্যামিবার উপকূল ছুঁয়ে
কতো-না ঘটনা, কতো মগ্ন প্রবর্তনা
মায়ামূর্তি ধরে;
আর তাই উদ্ভিদে ও সরীসৃপে,
ম্যামথে, মানুষে,
পুরনো প্রস্তর দিনে, অগ্নি-আবিষ্কারে
এ চেতনা নিত্য স্বয়ংবৃত;
আর তাই হিমযুগে,
তুষারে, প্লাবনে,
শতাব্দীর পলিতে শতাব্দী
আগুনে ও ধনুর্বাণে,
ইস্পাতে ও অণুবিদারণে

ঢেউয়ে ঢেউ নিয়ত উত্থিত ;
আর তাই মনীষার এ দৃপ্ত উৎসার—
সে কি আর থাকে জীবন্মৃত ?

সময় চুদিকে। ঐ সম্মুখে তোমার
অনাগত রাশিচক্রে ঘুরে ঘুরে নাচে মহাকাল,
দৃশ্যে, দৃশ্যান্তরে
দিনে দিনে,
ধারণার বিস্ফোরণে
চেতনার ওলটপালটে
খোলে ঐ আড়ালের ওপারে আড়াল,
তারই ঢেউ জীবনের তটে,
দেশে ও বিদেশে, দেশে দেশে,
তরঙ্গের শিখরে তরঙ্গ—
সে কি আর মানে কোনো বাঁধ ?
অনন্ত যৌবন তাই রুদ্র, বহুভঙ্গ,
আগুনে পাথরে দ্রোহে ওঠে আজ হেসে,
আদিগন্ত কোটি কোটি হাত
ছুঁড়ে ফেলে মৃত যতো প্রতিষ্ঠান, সংঘ।
তারই ঢেউ বুকে লাগল এসে।

গঙ্গাহৃদি বঙ্গ, জানি নাকি
ধ্বংসস্তূপে হাহাকার, অশ্রু আর ঘৃণা ?
এক-একটা সময় তবু আসে—
শিখরে শিখর, যেন সংঘর্ষে সংঘর্ষ,
বেজে কি ওঠে না অগ্নিবীণা ?

সে একটা অস্থির দিন,
আমি জানি নাকি ?
সে একটা উৎক্ষিপ্ত যুগসন্ধি।
তবু, আমি স্বপ্ন,

আমি নিয়ত নির্মাণ,
আগুনে পাথরে দ্রোহে খুঁজি শুধু সময়ের গ্রন্থি।
শতাব্দীর শেষে, কিংবা কয়েক শতাব্দী
পার হয়ে মানব-যাত্রার
আলো-অন্ধকারে, ঝড়ে, রুদ্র বহুভঙ্গ,
আমি কবি, কী থাকে আমার,
এই জন্ম, জন্মভূমি, এই
চেতনারই বিস্ফোরণে তরঙ্গে তরঙ্গ—
মানুষে মানুষ, প্রশ্ন, দিগন্ত উৎসার ॥

[অংশ]

॥ ৫ ॥

কথাটা এগিয়ে চলা ;
বুকে-হাঁটা পাহাড়ে খাড়াই।
কথাটা আগুনে নামা ;
সাড়া তোলা মানুষের ঘরে।
কথাটা এগিয়ে চলা ;
জলে-ওঠা সংঘর্ষচূড়ায় ;
কথাটা জীবনে খোঁজা— সময়ের উথাল পাতাল
রক্তে কার পদচিহ্ন পড়ে।

কেননা উত্তরে যাও
অথবা দক্ষিণে,
ইতিহাসে অথবা হৃদয়ে,
পূর্বে বা পশ্চিমে যাও
শত জাতি-অধ্যুষিত ভূগোলের পলিতে বা মনে,

একটা পথ হাড়িকাঠে মাথা
জাগে দিনে রাতে ;
তাই তো শতাব্দী থেকে শতাব্দীর অন্ধকারে ঐ
হারানো শহীদ যতো উঠে আসে আজ,
হাত রাখে হাতে।

কে ঐ কোমরে-বাঁধা সাজানো বুলেট
প্রথম গুলির শব্দে উদ্ধত ভারত ?
তুমি কি মঙ্গল পাঁড়ে ? ব্যারাকপুরের
তোপের ছিটকানো মুখে প্রাণ দিয়ে তবু
খুলে দিলে পথ ?

কে ঐ তীরের ফলা, আঁধারে নিকষ
সাঁওতালী পাহাড় ? তুমি
বিরশা-সিধু, শালপাতার প্রতীকে আগুন ?
তুমি কাহ্নু টাঙি-হাতে লালমাটি-রাঙা
ঢেলে দিলে খুন !
তুমি কি বাংলার ঘরে জেগে-ওঠা বীর
কামানের আগুনের বেড়াজালে ঐ
বাঁশের কেল্লার তিতু মীর ?
কে তুমি পাষাণ-কারা ভেঙে খানখান
এমন কঠিন স্বপ্নে কোমল কিশোর
'একবার বিদায় দে মা' গেয়ে গেলে গান ?
ঐ তো এলেন উঠে ক্ষুদিরাম, কানাইলালের
পদশব্দে কাঁপে দিকসীমা।
ঐ তো এলেন ঐ চট্টলের অস্ত্রাগার ভেঙে
প্রীতিলতা, জালালাবাদের
রাইফেলের পাশে টেগরা, সূর্য সেন, সূর্যের মহিমা।
ঐ তো ভগৎ সিং ! সারা দেশে উন্নত মহান

আসমুদ্র ঘরে ঘরে যারা দিনে দিনে
ফাঁসির দড়িতে দিল প্রাণ !
ওরা এল বোম্বাইয়ের বুলেটের মুখে তেজীয়ান
দলে দলে বিদ্রোহী নাবিক ;
ওরা এল স্বাধীনের ভারতী দিনের
পরাধীন ভূমিদাস, কলের মজুর ,
ওরা এল স্ত্রীপুরুষ শহুরে মানুষ ,
কেউ তারা কলকাতার পথের মিছিল,
কেউ তারা তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপের চাষী,
প্রতিটি হৃদ্‌পিণ্ডে-বেঁধা সিসের গুলির
পোড়া বারুদের দাগ বুকে নিয়ে তবু
মুখে জাগে হাসি ।

অযুত শহীদ আসে,
পায়ে পায়ে লাখো লাখো বীর,
সব দেশ, মহাদেশ সময়ের শতাব্দী ডিঙিয়ে
পদশব্দ ক্রমেই অস্থির ।
যতো স্বপ্ন উচ্চারিত, যতো সাধ মিশেছে হাওয়ায়,
যতো প্রশ্ন অনুত্তর, যতো রক্ত ঝরেছে মাটিতে,
এ কালসন্ধির লগ্নে সব ঋণ তারা শোধ নিতে
তোমারই অগ্নির পাশে, ভিয়েতনাম, অলক্ষ্যে দাঁড়ায় ।

ঐ তো বাস্তিল থেকে পিতামহ দিন
হাজার নিশান হাতে উঠে আসে, তার
গলায় উদ্যত গিলোটিন,
মুখে তবু উচ্চারিত মানুষেরই জন্ম-অধিকার ।
ঐ সাদা বরফের নির্বাসিত ঘরে
সাইবেরিয়ার পথে কতো-না শহীদ,
তিল তিল আত্মদানে দধীচির বরে
গড়েছে অক্লান্ত যারা জীবনের ভিত ,

ঐ সারা রাশিয়ার, ওডেসার, ডনের, ভল্গার
হাজার শহরে গ্রামে, পেত্রোগ্রাদে, দূর এশিয়ার
তাজিক, কাজাক, শত শ্রমিক কৃষাণ—
মৃত্যুর সমুদ্র ছেঁচে পৃথিবীকে যারা
শুনিয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী গান।

ঐ আসে মার্কিনের দূর উপকূলে
সাক্কো ও ভেনসিত্তি দুই কালেব মশাল,
দুর্জয় সাহসে যারা রক্ত ঢেলে তবু
ছিঁড়ে গেছে ছলনার জাল।
ঐ তো রোজেনবার্গ দম্পতি কেমন—
বিদ্যুতের চেয়াবের পীড়নের ফাঁদে
আমৃত্যু নীরব প্রতিবাদে
একবিন্দু টলেনি যে-মন।
ঐ কালো মার্কিনের ঘেটোর শিকার,
ঐ সাদা মার্কিনের নামহীন নাবী ও পুরুষ,
হটাতে লড়াই-ক্ষ্যাপা লোভান্ধ বিকার
বুকে যার বিঁধে গেছে ক্রুশ!
ঐ তো কাস্ত্রোব সাথী গুয়েভারা বীর,
মানুষের যন্ত্রণার পীড়নে অস্থির,
কোন্ দূর বলিভিয়া, খামারের দূর পরবাসে
প্রাণ দিয়ে, উঠে আসে ঐ
মানুষেরই পাশে।

ঐ তো লুমুম্বা ঘন অরণ্যে নির্ভীক
সিংহহৃদি আফ্রিকার প্রাণ ;
স্বস্তিকার স্বস্তিহীন দাপটের মূলে দিয়ে টান
ফাঁসির মঞ্চের থেকে ঐ তো ফুচিক। ·
ঐ সারা পৃথিবীর কোটি কোটি অজানা তরুণ—
স্পেনের প্রান্তরে, গ্রীসে, মহাচীনে, কোরিয়ার মাঠে,

এ জীবন জেলে দিয়ে সমিধের কাঠে
তারাই তো ঘরে ঘরে অনির্বাণ প্রাণের আগুন।

অযুত শহীদ আসে,
পায়ে পায়ে লাখো লাখো বীর ;
সব দেশ মহাদেশ সময়ের শতাব্দী ডিঙিয়ে
পৃথিবীর গূঢ়তম নাটকের শেষ অঙ্কে আজ
ওরা করে ভিড়।
এবং সবার আগে ঐ
সায়গনের অবরোধে হেনে পদাঘাত
মহান শহীদ বীর
মৃত্যুর বুলেটে ছেঁড়া বুকের ধমনী,
দুর্জয় সাহসে তবু স্থির,
'এদেশ আমার' জয়ধ্বনি—
চলেন ভ্যান ত্রোই!

এ এক অদ্ভুত যুদ্ধ—কে থাকে, কে যায়!
কবে যেন কার হাত দূর ইতিহাসে
কেবলই গলার দিকে আসে,
কবে যেন কার হাত কেবলি বাঁচার পথ খোঁজে
তার কালগ্রাসে।
এ দুই হাতের পাঞ্জা শতকে শতকে উঠে পড়ে
ভিয়েতনামে শেষের বিচার—
এ কাল-সন্ধির লগ্নে কে থাকে, কে যায়,
জেগে ওঠে তারই অন্তঃসার।
মানুষ দুনিয়া জোড়া ধমনী শিরায়
টের পায় জোয়ারের মতো
শতাব্দীসমুদ্রে আজ লেগেছে কোটাল ;
মৃত প্রথা-প্রতিষ্ঠান স্তম্ভ-পতনের
স্রোতের করাল টানে ভেসে যায় ঐ

পুরনো জঞ্জাল।
মানুষ ছুনিয়া জোড়া চেয়ে দেখে আজ
মরীয়া মার্কিন যতো পীড়নে ভীষণ
ততো তাকে টানে চোরা বালি ;
যতো ডোবে ততো তার আথালিপাথালি !

এ এক মহান যুদ্ধ—গূঢ়তম নিয়মে স্বাধীন ,
ঘন অশ্রু-অন্ধকারে অগ্নিশিখা হাজার মানুষ
পৃথিবীর বুক থেকে ছুঁড়ে ফেলে বেঁধানো অঙ্কুশ,
নিশানের মতো জ্বালে দিন !
এ এক মহান যুদ্ধ—
যেখানে যা-কিছু বাঁচে, নড়ে,
পায়ে পায়ে তারি ভবিষ্যৎ ,
যতো স্বপ্ন উচ্চারিত, যতো রক্ত ঝরেছে মাটিতে,
পৃথিবীর দেশে দেশে হারানো শহীদ
দিনে রাতে গড়েছে যে পথ—
এ এক মহান যুদ্ধ, তারি ডাক রক্তের ভিতরে
প্রতিধ্বনি—নিহিত শপথ !
আর তাই কোটি কোটি জেগে-ওঠা ঘরে
শত পূর্বপুরুষের স্মৃতির বাঁধনে
পরিচিত মাঠজল-গাছগাছালির
শতাব্দীর গলিতে বা মনে
যেখানে যা-কিছু বাঁচে, নড়ে,
তিলে তিলে তারই ভবিষ্যৎ—
অশ্রুর লবণে ক্রোধে টাল খায়, বাঁকে,
হাতে নেয় কালের লাগাম ;
আর তাই রাত্রিফাটা উষার শিখরে
অন্ধকারে দপ্ করে সূর্যের সোনায়
এ কালসন্ধির লগ্নে জ্বলে ওঠে ঐ
ভিয়েতনাম—লাল ভিয়েতনাম !

উদ্ধত শিমুল

নদীটা যেখানে বাঁকে
ধনুকের মতো,
সর্বদা যেখানে স্রোতে
ছিলাটানা বেগ,
যেখানে পাড়ের মাটি
বিধ্বস্ত মুখের মতো কর্কশ, আদিম,

সেখানে, জলের থেকে দশহাত উঁচুতে
পতনের মুখোমুখি
উদ্ধত শিমুল এক প্রোথিত মাটিতে
কবে যেন দেখেছি কোথায়
ডালে ডালে জ্বালে অগ্নিশিখা,
·· আমার কবিতা আজীবন
তারই দূর প্রতিধ্বনি, ভাষ্য আর টীকা ॥

খড়্গের শাণিত দিকে

এ জীবন সর্বদাই আঙুলের চাপে
তারে-তারে বাজে না সুন্দর।
স্বপ্নগুলি নয় সহজেই
রঙে রঙে ভূদৃশ্য বা চেনা রূপকথা।

কে আর কঠিন চায়,
কে চায় যন্ত্রণা ?
তবু কারো কারো মন মানুষেরই ঘরে
সুখের আঙিনাগুলি পার হতে গিয়ে
খড়্গের শাণিত দিকে কেন যায় চলে ?

তাই কি বুকের বোবা অন্ধকারে শুনি
ক্রুর কাঠঠোকরার ঠোঁটে এই কাল
স্তব্ধতাকে যায় বিঁধে বিঁধে ?
দু'হাতে পেরেক তাই ? দু'পায়ে পেরেক ?
আর্ত তীক্ষ্ণ চেতনার এ জীবন তাই
ক্রুশে-বেঁধা পেরেক আমার।

আসলে কথাটা বাঁচা

কথাটা এ নয়, আমি একা আছি,
কথাটা বরং এই—
আমি খুবই আসঙ্গ-পীড়িত।
রয়েছে স্বজন বন্ধু আত্ম-পরিজন
পরিচিত হাজার মানুষ,
নিজের পাড়া ও পথ, প্রতিষ্ঠান, জীবিকা এবং
গাছপালা, মেঘবৃষ্টি, সকাল বিকেল,
ঘটনা ও ঘটনার আড়ালে জটিল
বহু টানাপোড়েনের তাঁতে বোনা এই
প্রত্যহ আমারো আছে— মনের উপরে
পোশাকী সাজের মতো,
তবু আমি মনের ভিতরে
কতোদিন আছি একা, অর্ধ-নির্বাসিত।

আসলে কথা তো এই—
বেঁচে থাকা ? বন্ধুকে বলুন।
কৈশোর ডিঙিয়ে ওরা
যৌবন ডিঙিয়ে ওরা
প্রৌঢ়তা ডিঙিয়ে ওরা

যেন এক দমকাটা হার্ডল রেসের
মৃত্যুর বুড়িটা ছুঁতে প্রতিযোগী রোজ।
প্রতিষ্ঠান, ভালোমন্দ ধারণারও তাই—
সব মৌল সদিচ্ছার ক্লান্ত ভূমিক্ষয়ে
বাজেটের অডিটের বছরে বছরে
খাঁচাটাই দোলে শুধু বারান্দায়, তার
পাখিটা নিখোঁজ।

না, আমি একাকী নই। বুকের ভিতরে
অনেক বাইসন-মুণ্ড, বাঘ-ছাল, হরিণের শিঙ;
অনেক কবরখানা, স্মৃতিস্তম্ভ, সমাধিফলক;
একেকটি দিনের শেষে পরিচিত পৃথিবীটা যে৷
রক্তের ভিতরে রাখে একেকটি ফসিল;
পাথরের ভার বয়ে দিনেরাতে তাই
সুদূর বাস্তিলে চোরা-কয়েদে এখন:
খুঁজে ফিরি খিল।

আসলে কথাটা বাঁচা, প্রতিদিন প্রতিটি মিনিে
নিবিড় গভীর চাষে নিজের ভিতরে
ফসল ফলানো, আর তোলা বীজধান;
আসলে কথাটা বাঁচা, বছরে বছরে
সব নবযুবকের, বালকের, শিশুদের ঘরে
তাদেরই পায়ের নিচে মাটি চিনে চিনে
বাঁচা— মানে নিয়ত নির্মাণ।

জামায় রক্তের দাগ

জামায় রক্তের দাগ,
কে তুমি জানলায় ?
কোন পথ হেঁটে তুমি কোন প্রশ্ন নিয়ে
দাঁড়ালে আমার মুখোমুখি ?
তোমার চোখের নিচে
রাত্রি, নাকি ভোরের আকাশ !
অনেক কৈশোর, বহু যৌবনের মলাটে মলাটে
তোমারই কি দেখেছি আভাস ?
নাকি তুমি ঘটমান চলন্ত একাল ?
সময়ের ফুটনোটে পুঁথির ভিতর
সব পূর্বলিখনের ছকগুলি ভেঙে
নিয়ত যা ফাটে ?

জানি না কী নামে তুমি
কলকাতায়, নাকি দুর্গাপুরে
তরাইয়ে, না মেদিনীপুরের
কোন মাটি গায়ে মেখে, জন্ম নিয়ে, আজ
কোন স্বপ্নে চলেছ কোথায় ?
জানলার এপারে আমি বিগত রাত্রির
অন্ধকার বুকে নিয়ে জাগি নিরুপায়।

তোমাকে কি চিনি আমি ?
কোন অশ্রু এমন পাথর !
কোন রুদ্র ভালোবাসা আত্মবলিদানে
বারুদে আগুন !
কে তুমি, দু'চোখে চোখ ? কোন যন্ত্রণায়
আমারও এ কবিতায় শোধ খোঁজে আজ
তোমারই ও জীবনের ঋণ !